প্রকাশকের ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থটি জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের চরিতমালার দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথমটির নাম "তোমাদের বন্ধু লেনিন।" সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্রষ্টার জীবনকে কেন্দ্রকরে লেখা হয়েছে প্রথম গ্রন্থ।

দ্বিতীয়টি তাঁরই উপযুক্ত শিষ্যের জীবন চরিত। আমরা চরিতমালা প্রকাশের সময় বিশেষ করে একটি জিনিসের দিকেই লক্ষ্য রেখেছি। তা হচ্ছে খুবই সহজ গল্পের মত মনোজ্ঞ করে সামান্য সামান্য ঘটনাকে যথাযথ রূপ দিয়ে এই সব বিপ্লবী নায়কদের জীবন ছোটদের সামনে মূর্ত করে তুলতে।

ষ্ট্যালিন রহস্যময় নেতা! নিজের জীবন তিনি এমন করে বলশেভিকদলের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছেন যে তার পৃথক অস্তিত্বই ধরা পড়ে না কারুর চোখে! এই আপাত কাঠিন্য থেকেই তাঁর নাম হয়েছে "লৌহমানব।" কিন্তু আবার এই মানুষই কবিতা লিখতেন এককালে!

দুঃসাধ্য হলেও তরুণ লেখক চেষ্টার ত্রুটি করেন নি চরিত কথাকে জীবন্ত করতে। তবে তিনি কতটা সফল হয়েছেন তার বিচার করবে কিশোর বন্ধুরা! আমার বিশ্বাস তাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

তখন ঘুমন্ত জর্জিয়া জেগে উঠেছে। মাঠের পর মাঠে স্তব্ধতার রাজত্ব নেই, পাহাড়ের গায়ে রাখালের গানের ঝঙ্কার ভেসে বেড়ায় না। এখানে ওখানে জেগে উঠেছে কল কারখানা। গোরীর অবাধ আকাশে হেমন্তের রোদ্দুর ছুটো-ছুটি করছে না, শিশির ভেজা ঘাসের বুকে ছোট ছেলে-মেয়ের পা আর দাপাদাপি করছে না। এখন তারা ওঠে, পূব আকাশে হয়ত কাঁপে শুকতারা, এখানে ওখানে ধোঁয়াটে কুয়াসা দোল খায়। তবু আকাশ কাঁপিয়ে বেজে ওঠে কারখানার বাঁশী। ঘুমিয়ে পড়া গ্রাম জেগে ওঠে পথ চলতি মানুষের পায়ের আঘাতে। বণিক এসেছে, কল উঠেছে। উঠেছে উদ্ধত বাড়িগুলো আকাশের বুকে মাথা তুলে। আলো ঝলমল্ প্রাসাদ আর তারি ঠিক পাশে বস্তি। আলো নেই, বাতাস নেই, আছে সামর্থ, অদম্য প্রাণ প্রাচুর্য। এরা এখনকার কারখানার শ্রমিক মাঠে, যায় না।

১৮৮৮ সালের এমনি এক ম্লান সন্ধ্যা। কারখানার ছুটি হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় সাড়া জেগেছে। তেল কালি মাখা মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ভাসছে টুকরো কথা, শঙ্কিত চাপা কথা। গলা ছেড়ে বলবার উপায় নেই—হয়ত পিছন থেকে ঝাপটে ধরবে ধূর্ত জারের চরেরা। ওরা থাকে লুকিয়ে নেকড়ের মত সব সময় উৎকর্ণ হয়ে, চোখে জ্বলে শিকারের নেশা। তবু প্রাণের ভেতর কথা গুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা বেরিয়ে আসবেই, বর্তমানের অত্যাচারের কাহিনী তারা বলবেই।

ওদিক থেকে ফিরে আসে চাষী। সারা দিনের খাটুনির পর খেতে বসে। "একি? তোমরা এই খাও নাকি?" প্রশ্ন করে আট বছরের এক ছেলে। চাষী অবাক হয়ে তাকায় মুখের দিকে। এ আবার কোন দেশের কথা!

"সারা দিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পর এই খাবার পেলে? কালো রুটি আর সোয়াবিন? অথচ এবার কত ফসল ফলিয়েছ বল তো?"

চাষী এতক্ষণে সামলে নেয়। শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বলে "ফসল তো এবার ফলেছে অনেক। বুঝলে, এমন ফসল বহুকাল দেখা যায়নি। কিন্তু কি আর করা যাবে বল, কপাল খারাপ। পুলিশ দারোগা নিয়ে গেল কিছুটা। আবার জমিদারকে দিতে হ'ল। তার ওপরে এতগুলো পুষ্যি। কি আর করি—এর চেয়ে ভাল খাবার যোগাড় করি কি করে?"

"ঠিকই তো," গম্ভীর ভাবে ছেলেটি বলে উঠলো। এই দেখো, খেটে খেটে হাড় কালি করে ফেললে। খেতে পেলে কি? পুলিস দারোগা, বলি এরা তোমার ফসলের জন্য করেছে কি? তোমার ফসল অবধি চৌকি দেয়নি। ধরো জমিদার শুধু জমি দিয়েই খালাস। তারপরে তোমার ঘাড়ে, রোয়া, বোনা, বলতে কি সব খরচাইতো তোমার। ফসল ফললে, জমিদার এসে ভাগ নিয়ে গেল, পুলিশ এসে জুলুম চালালো। কেন—কেন এসব হবে? তোমরাই বা সহ্য করবে কেন?" ছেলেটি বলে চললো—যেন চাষীর কোন বন্ধুই কথা বলছে। প্রত্যেকটি কথা বুকে গিয়ে বিঁধছে, চাষীর চোখ জ্বলে উঠছে। "এর প্রতিকার করতে হবে আমাদের নিজেদের" ছেলেটি এখনো বলে চলছে। চাষী মাথা উঁচু করে শুনছে। তার পরে বললো—"তা বাবা একলা আমায় বলে কি হবে? কথাগুলো তো বর্ণে বর্ণে সত্যি। তা এই রবিবারে, তুমি যদি একবারটি এসো—। কারখানারও ছুটি আমরাও থাকবো।"

ছেলেটি হেসে বললো, "তা তো খুব ভাল কথা। আমি আসবো।" ছেলেটি যাবার জন্য পা' বাড়াল।

চাষী বললো, "তা বাবা তোমার নামটা কি—তা তো' জানা হয়নি।"

একটু হেসে সে বললো—"ও আমার নাম? আমার নাম জোসেফ, ভিসারিয়ণ যুগাশভিলির ছেলে। গোরী শহরের শেষে আমাদের কুঁড়ে। বাবার নাম করলে চিনিয়ে দেবে।

আমায় সবাই 'শোশো' বলেই ডাকে।" শোশো চলে গেল।

* * *

১৮৯৪ সাল। পাদ্রী স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে। এ বছরের মত ছুটি হয়ে গেল। আজ সাড়া পড়ে গেছে ছেলেদের মধ্যে। শোশো সব চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে। বন্ধুর দল এসে ধরেছে তাকে আজ সবাই বেড়াতে যাবে একসাথে। আজকে পাদ্রী স্কুলের পড়া শেষ হলো। "শোশো, এবার কোথায় পড়বে?" "তুমি কোথায় যাবে শোশো" নানা রকমের প্রশ্ন এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে শোশো তার জবাব দিয়ে যায়।

গুরডিস শোশোর এক বন্ধু। সে বললে,—"যা হোক ভগবানের দয়ায়—"

শোশোর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটু চুপ করে সে বললো, "জানিস গুরডিস্, ভগবান বলে কিছু নেই। ওই ভগবানের নাম করে ওরা আমাদের ঠকায়।"

গুরডিস অবাক হয়ে গেল। এর আগে সে এমন কথা কখনো শোনেনি। বলে ওঠে, "কি বলছিস্ শোশো? তুইতো আগে এমন কথা কখনো বলিস নি।" একটু চুপ করে থাকে বন্ধুটি। তারপরে রেগে বলে ওঠে "কেমন করে বলছিস ভগবান নেই?"

বন্ধুর একটা হাত ধরে শান্ত কণ্ঠে শোশো বলে, "আচ্ছা· আমি তোকে একটা বই দেবো পড়ে দেখিস।

বুঝতে পারবি আমরা কত ভুল ধারণা নিয়ে থাকি। ভগবান একদিন এসে হঠাৎ এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন নি, ওটা একেবারে বাজে কথা।”

“কি—কি বইটার নাম কি?” আগুন হয়ে ওঠে বন্ধু।

“ডারুইনের নাম শুনেছিস? ডারুইনের বই। পড়ে দেখিস অদ্ভুত সুন্দর।”

*   *   *

শোশো তার ঘরে বসে হাতে লেখা একটা মোটা বই পড়ছে; ঘরের দরজা বন্ধ। শোশো তার সমস্ত মনটা ঢেলে দিয়েছে বইটার ওপর। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। শোশো ব্যস্ত হয়ে উঠলো তাড়াতাড়ি বইটি মুড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করলো, “কে?”

“আরে আমি, দরজা খোল না।”

“পারকেডজ?”

বাইরে থেকে উত্তর এলো, “হ্যাঁ।”

শোশো দরজা খুলে দিল।

এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে উত্তেজনাটা একটু থিতিয়ে গিয়েছিলো। তবু শোশোর সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে সে বললো, “আচ্ছা তুমি কি সত্যিই এ বিশ্বাস করো? তুমি কি বিশ্বাস করো,

‘আজকে যারা ভারের চাপে পড়ছে নুয়ে নুয়ে—
পদতলে পড়ছে অসহায়
তবুও জানি, সঠিক জানি ঘৃণার আগুনে

জ্বলবে ওরা,

আশার ডানা মেলবে ওরা

মেলবে ওরা জানি।'

"আজকে সবাই এটা পড়ে একেবারে পঞ্চমুখ। জর্জিয়ার কবি রেফাইলের উদ্দেশ্যে যে সংস্করণটা বেরুচ্ছে তাতে বোধ হয় তোমার এ কবিতাটা ছাপবে। কতদিন এমন আশার কথা শুনিনি।"

শোশো হাসতে হাসতে কথাগুলো শুনছিল। দরজায় নজর পড়তেই সেটাকে বন্ধ করে দিল। বন্ধুটি আবার বললো, "আচ্ছা শোশো, তুমি কি সত্যিই এ কথা বিশ্বাস করো?" শান্তভাবে শোশো উত্তর দিল, "নিশ্চয় করি।"

অবাক্ হয়ে গেল বন্ধুটি। সে আবার প্রশ্ন করলো, "কেমন করে এল তোমার এ বিশ্বাস?"

শোশো কোন কথা না বলে টেবিলের উপর বইটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

"এ্যাঃ" অভিভূত হয়ে গেল বন্ধুটি। কোন রকমে বললো, "এ যে কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল। এ তুমি পড় নাকি?"

"কেন তাতে কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে? পুলিসের চোখে একবার পড়লেই হয়। সেমিনারের বুড়ো পাদ্রী একবার যদি এর গন্ধটি পান তা হলে তোমায় আস্ত রাখবেন না। কি আনন্দ যে পাও!"

"তোমাদের সেমিনারের এই সব অসভ্য ব্যবহার, বিচারের নামে অবিচার, এ সব দেখে শুনে আমি বিরক্ত হয়ে

গেছি। এ সবগুলোই আমাকে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের মুখে ঠেলে দিল।” শোশো একটু চুপ করে থাকলো। তারপরে যেন আপন মনেই বলে উঠলো, “চোদ্দ বছর বয়সে আমি এই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসি। আজ প্রায় আরো দু' বছর কেটে গেল। ট্রান্স ককেসিয়ায় যে সব গুপ্ত আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল সেখানেও আমি যেতুম। সেখান থেকেই আমি মার্কসবাদকে ভালবাসতে শুরু করেছি।

“আর আজকের এই টিফল্‌স। এখানে বই পাওয়া যাবে না—পড়াও যাবে না। বই পড়া আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু ওরা কি করবে আইন করে? বই আমরা পড়ি। তোমার চোখের সামনে রয়েছে ক্যাপিটাল্। সারা শহরে আছে একটা মাত্র বই। উপায় কি? কপি করে চালাচ্ছি—এমনি ভাবেই চলবে।

“বলছিলে না—সত্যিই বিশ্বাস করি কি না? ১৮৯৮ সালে প্রথমে আমার উপর রেল মজুরদের পাঠচক্রের ভার পড়ে। যাই সেখানে। যে দিন আমি প্রথমে সেখানে গেলাম সে দিন থেকে আমি প্রথমবার বিপ্লববাদে দীক্ষিত হলাম। আমার শুরু হলো সেখান থেকে। এই টিফলিসের শ্রমিক আমার প্রথম গুরু।”

“তোমার পড়বার আকাঙ্খাই একদিন বিপদ টেনে আনবে। কেন, ওই বে-আইনী বইগুলো না পড়লে কি চলে না? কিছুই বুঝি না বাপু।”

“বুঝতে তো চাও নি। চল, সন্ধ্যা হয়ে গেল, পার্ক থেকে ঘুরে আসি।”

ডিসেম্বরের শীতের সকাল। ঘণ্টা পড়েছে। পাদ্রীদের বড় স্কুল এবার শুরু হবে। একটু দেরি করলে উপায় নেই, চাবুক চলবে। ছেলেরা সবাই ছুটছে—পপনেজও ছুটছে। হঠাৎ দেখে পার্কের মাঝখানে বেশ জটলা পাকিয়ে উঠেছে। ঘণ্টা পড়েছে তবু কারো হুঁশ নেই। মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা ছিপ্ ছিপে সুন্দর ছেলে আলকাতরার মত কলো চুল, ভাসা ভাসা টানা উজ্জ্বল চোখ। ছেলেটা বলে চলেছে ঘুণ-ধরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, প্রচলিত ভাব ধারার বিরুদ্ধে দিচ্ছে চোখা চোখা যুক্তি। তাকে ঘিরে চলেছে তর্কের বন্যা।

"ওরে ঘণ্টা পড়েছে যে—" ওদের ভেতর থেকে কে এক জন বলে ওঠে।

"এ্যাঃ"—দেখতে দেখতে ভিড় ফাঁকা হয়ে যায়। পপনেজ প্রশ্ন করে, "এসবগুলো শিখলে কোত্থেকে শোশো?"

"জান, আজ প্রথম আমি লেনিনের লেখা পড়লাম। এত ভাল লাগলো—বলবো কি। যে করেই হোক আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।"

* * *

১৮৯৯ সাল। ২৭শে মে। পাদ্রী স্কুলের কর্তাদের আজ এক মিটিং বসেছে। স্কুলের সুপার ফাদার ডিমিট্রি বলছেন, "২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সালের কথা শুনুন। তখন রাত ৯টা। খাওয়ার ঘরে খুব চেঁচামেছি হচ্ছে। জোসেফকে ঘিরে একদল ছেলে হল্লা করছে। গিয়ে দেখা

গেল জোসেফ তাদের অবৈধ বই পড়ে শোনাচ্ছে। ছেলেদের শাসন করা হয়। জোসেফের কাছ থেকে পাওয়া যায় ভিক্টর হিউগোর 'টয়লার্স অফ দি সি।' তখন সুপার ছিলেন মুরাকভস্কি। তিনি বইটা কেড়ে নিলেন। ও বছর নভেম্বর মাসেই জোসেফের কাছ থেকে ভিক্টর হুগোর আর একটা বই পাওয়া যায়। এবার তাকে দুঘন্টা সেলের ভিতর আটকে রাখা হয়। এবারের মার্চ মাসে ওর কাছ থেকে আবার অবৈধ বই পাওয়া গেল, কিছুদিনের জন্য এবার ওকে আটকে রাখি। এমনি করে তেরো বার ওর কাছ থেকে বই পাওয়া যায়—সাবধান করেছি, শাস্তি দিয়েছি অনেক বার। কিন্তু একবারও কথা শোনেনি। সে নিজে বই পড়ে ঠাণ্ডা হবার ছেলে নয়। ক্লাসের সব ছেলেদের কাছে পাওয়া যাবে তার বই। যখন বইগুলো চাইলাম তখন স্কুলময় হট্টগোল উঠলো। তার মূলে রয়েছে ওই জোসেফ।

"১৬ই ডিসেম্বরের কথা বলছি। চার্চের ঘণ্টা পড়ে গেছে। জোসেফের সে দিকে খেয়াল নেই। সে দিব্যি একটা গাছের আড়ালে বসে বই পড়ে চলেছে। আর একদিনের ঘটনা বলবো। আমি জোসেফের ঘরে গিয়েছি। তার সেদিকে খেয়াল করবারও সময় নেই। আমার রাগ হলো। বললাম, 'তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখেছো?'

"চোখটা একটু রগড়ে সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ একটা কুলাঙ্গার।' তারপরে আবার পড়তে শুরু করলো। এমনি তার ঔদ্ধত্য!

সেই জন্য আমার মনে হয়, স্কুলের অন্য ছেলেদের দিকে চেয়ে, জোসেফকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।" একজন সভ্য বললেন, "তাড়াবেন, কিন্তু তার কারণ কি দেখাবেন।"

সবাই যেন একটু ভাবিত হয়ে পড়লো। অনেক খোঁজা খুঁজির পর দেখা গেল, শোশো একটা পরীক্ষা দেয় নি। ফাদার ডিমিট্রি হাঁফ ছাড়লেন। এবার ডাক পড়লো শোশোর।

শোশো এসে দাঁড়াল। তার সামনে পড়ে দেওয়া হ'ল কমিটির প্রস্তাব। শোশো যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে বললো, "কিন্তু একি ফাদার, আসল কথাটা একেবারে চেপে গেলেন। বলেই ফেলুন না আমি এখানে মার্কসবাদ প্রচার করি, টিফ্লিসের রেল ধর্মঘটের সময় আমাকে সবার আগে দেখা যায়। হালফিল্ আপনাদের নাকের উপর এই প্রথম এত বড় মে দিবস হয়ে গেল। ঘাবড়ে গেছেন, তাই না?"

ক্ষিপ্ত হয়ে ডিমিট্রি চিৎকার করে উঠলো,—"হ্যাঃ হ্যাঃ মার্কসবাদ আমরা সইবো না—"

কমিটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শোশো বললো, "এতো জানা কথাই।" শোশো বাইরে এল।

টিফ্লিস শহরের শ্রমিক পল্লী। সবাই কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘেঁসাঘেঁসি করে গোটা কতক বাড়ি দাঁড়িয়ে

রয়েছে যেন খুব ভয় পেয়ে জড়াজড়ি করছে। তারি একটা অন্ধকার ঘরে বসে দু'জন কথা বলছে একটু চেপে চেপে। মুখে বেশ একটা উদ্বেগের ছায়া নেমেছে।

"কিন্তু কি করবে শোশো ?" একটা স্বর ভেসে এল।

কোন উত্তর নেই।

"কেন যে তাড়াতাড়ি কাজটা ছেড়ে দিলে ? পুলিসের চোখ এখন সব সময় তোমার পিছনে ঘুরছে।" হতাশায় ভেঙে পড়ল স্বরটা। শোশো শান্তভাবে জবাব দিল, "একটা কিছু ভেবে ঠিক করতে হবে বৈকি লেডো।"

তারপর বহুক্ষণ চুপ চাপ। হঠাৎ লেডো বলে উঠলো, "অবজারভেটেরিতে একটা চাকরি খালি আছে। যাবে সেটায় ?"

ঘরটায় যেন প্রাণ ফিরে এলো। শোশো বললো, "তা— আর মন্দকি ! এখুনি !"

"কিন্তু ওখানে বড় খাটুনি। কোন লোক তিন মাসের বেশি টিকতে পারে না।"

"আর খাটনির ভয় করলে চলবে কি করে ?"

হঠাৎ এক বন্ধু এসে হাজির। মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে চৌকাঠ পেরিয়ে টুপিটা আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে খুব জোরে হেসে উঠলো।

"কি হে, কি হলো।" লেডো প্রশ্ন করে।

"ও বেটাদের আজ জব্দ করেছি।" এই বলে বুক পকেট থেকে পুলিসের সিল মোহর দেওয়া একটা চিঠি বার করলো।

সবাই সেটাকে দেখতে লাগলো। বন্ধুটি বললো, "এলো প্রথমে আমার ঘরে, বললো সার্চ করবো। আমি বললাম, এ আর এমন কি ভয়ানক কথা, স্বচ্ছন্দে। তার পরে এটা ওটা সেটা খোলাখুলি চললো কি আর করবে, ছিল খান্‌কতক একেবারে নিরীহ বই। তাই নিয়ে চললো শোশোর ঘরে। মনে ভেবেছিল আমার ঘরে বিফল হলে হবে কি, পুষিয়ে নেবে ওখানে। বড় শীকার— হাত ছাড়া যাতে না হয় তার জন্য কত কড়াকড়ি। বেচারা—" বন্ধুটি আবার হো হো করে হেসে উঠলো।

লেডো বললে, "অমন করে হেসে মাটি করে দিও না--বল তারপরে ?"

"আরে শোন না—। শোশোর ঘরে গিয়ে এক লঙ্কাকাণ্ড। বালিসের ওয়াড় অবধি আর বাদ দিল না।

"কিন্তু সেখানেও বিফল হলো। দারোগার চক্‌চকে মুখ ক্রমে ক্রমেই কালো হয়ে উঠলো। আর আমার যতই পেট ফেটে হাসি বেরিয়ে আসছে, ওদের রাগ যাচ্ছে ততই বেড়ে। আমার ঘরে এসে দুই এক খানা বই তবু পেয়েছিলো, শোশোর ঘরে একেবারে তাও না ; আরে বোকার দল,—বুঝতেও পারো না—বই সব সময় ঘরে থাকে না। খুঁজতো যদি নদীর ধারের ইটের পাঁজাটা,—তবে, তবে যা হোক কিছু—"বন্ধুটি আবার হেসে ওঠে।

* * *

বাটুমের কারখানা।

ওসমান গুণ্‌ডেরনিজকে আজ বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছে। হাত পা নেড়ে সে মেসিনের তালে তালে কথা বলে

চলেছে। মাঝে মাঝে দেখছে ফোরম্যান আসছে কিনা। ওসমান বলছে তার পাশের লোকটাকে, "আজ ক' বছর ধরে এই তেলের কারখানায় কাজ করছি তো। অল্প-বিস্তর সভা সমিতিও করেছি, কিন্তু এমন যেন কোন দিন দেখি নি।"

লোকটা হাত চালাতে চালাতে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

"ষ্ট্যালিন এসে একটা কাজ করলে বটে"—ওসমান রেশ টানতে থাকে।

পাশের লোকটা বললো,—যেন আমাদের সকলকে এক করে দিল। আজকাল আমরা সকলের ব্যথা সকলে বুঝতে শিখেছি।"

"ঠিকই তো, এই ধরো তুমি জর্জিয়ার লোক। ক' বছর ধরে তো তোমার সঙ্গে আমি এক জায়গায় কাজ করতাম, তবু কিছুতেই যেন একেবারে মিলে যেতে পারতাম না। বলতো, না মিশে আমরা কত ঠকেছি। ষ্ট্যালিন এখানে এসে সে ভাবটা একেবারে যেন দূর করে দিয়েছে।"

ফোরম্যানের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। গ্রাহ্য না করে ওসমান বলে চলে, "আজ রাত্রে মিটিং আছে। জানতো ষ্ট্যালিন বলবে।"

পাশের লোকটা বলে, "কই, আমিতো জানিনে। তুমি শুনলে কোথা থেকে?"

একটু গর্বের সঙ্গে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ওসমান। পাশের লোকটার ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। বলে, "এটা আবার কি কাগজ।" মুখে একটা আঙুল দিয়ে চুপ করার নির্দেশ দেয় ওসমান। তারপরে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "ষ্ট্যালিন এখানে এসে তিনখানা কাগজ বার করেছে

গোপনে গোপনে। আমরা খুব সাবধানে চলছি। সব সময় খুব গোপন রাখতে হয়, কখন পুলিস সন্ধান পায়। তাই বেশি বার করতে পারিনে। আমরা সবাই ভাগ করে পড়বো।”

আচমকা কারখানার ছুটির বাঁশি বেজে ওঠে। ওসমান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বলে উঠলো, “চল আমরা সোজা ওখানে যাবো—মিটিংএ।” সহকর্মী রাজী হয়ে যায়।

মিটিং চলছে। ছোট্ট ঘরটা ভর্তি হয়ে গেছে। ষ্ট্যালিনের এক একটা কথায় সবাই হেসে উঠছে। ঠাট্টা থেকে কখন রাজনীতিতে নেমে এসেছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই। ষ্ট্যালিন বলে চলেছেন। শ্রোতারা কথায় যেন ডুবে গেছে।

ভাঙা জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে উঁকি মারলো। ষ্ট্যালিন বলে উঠলেন, “দেখেছো, ভোর হয়ে গেছে। খুব শীঘ্র আবার আমাদের সূর্যও উঠবে। সে ও জ্বলবে।”

কারখানার বাঁশি বেজেছে। রাত্রে ঘুম নেই। অনেকের খাওয়া হয় নি। একটা ছোট ছেলে প্রশ্ন করে, “আচ্ছা, শোশো কোন কারখানায় চাকরি করে ?

অবাক হয়ে একটা লোক বলে ওঠে, “কেন ?”

“ও তো সব কারখানার লোকদের কথা বললো। এত কথা আমরাই জানতাম না।”

হেসে লোকটা উত্তর দেয়, “ওর চোখ দুটোই আলাদা।”

* * *

তারপরে অনেক দিন কেটে গেছে। নতুন দিন এনেছে নতুন প্রেরণা। মার্চ মাসের বাটুম এগিয়ে চলেছে।

কারখানায় কারখানায় হরতাল। সকাল বেলার রোদ্দুর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মিছিলের পতাকায়। চিমনিগুলো স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। বুকের ধুকধুকুনি পর্যন্ত থেমে গেছে। কালো ধোঁয়া আকাশের বুককে আর কালো করে দিচ্ছে না। পুলিসের টনক নড়েছে। তারা খোঁজ পেয়েছে জোসেফ এসেছে এখানে। শক্ত হাতে এ হরতালের বন্যাকে রুখতে হবে—উপরওয়ালাদের কড়া আদেশ।

আজ বত্রিশ জনকে ধরে নিয়ে গেছে। শ্রমিক পল্লীতে সাড়া পড়ে গেছে। ১৯০২ সালের মার্চ মাস। বাটুমের পথে পথে মিছিলের ঐক্য! চোখে চোখে আগুনের শিখা। চাকা ঘোরানো শক্ত হাতটায় শক্ত করে ধরা পতাকা—ওহাত দিয়েই যেন দেশের ভাগ্য দেবে ঘুরিয়ে।

মিছিল চলেছে। শ্লোগান কাঁপছে—বীর বন্দীদের মুক্তি চাই। এগিয়ে চলছে জনস্রোত। তারি ভেতর ওরা বলাবলি করছে—"এমন মিছিল জীবনে কোনদিন দেখিনি।" সবার বুকের ভেতর যেন এই কথাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আইভান বলে, "আর কত অল্প সময়ের ভেতর না হয়ে গেল। কাল সকাল অবধি আমরা জানতুম না। ষ্ট্যালিন এসে একটা কাজ করলো বটে।"

জনস্রোত হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর যেতে দেবে না। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিসের লাইন। উদ্যত সঙিন সকালের সূর্যে চিক্‌মিক করছে। হাজার কণ্ঠ ফেটে পড়ছে "বীর বন্দীদের মুক্তি চাই।" হাজার হাত তালে তালে আকাশে উঠছে যেন সূর্যকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে।

সেনাপতি আনেড হাঁকছে, "তোমরা সবাই ফিরে যাও। কথা না শুনলে গুলি চালাবো।" এক মূহূর্ত থমথমে ভাব এলো। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে—চুপ্ চাপ্। ওরা ভাবছে কি করবে; ভাবছে এমন কি কেউ নেই যে ওদের মুখের উপর জবাব দিতে পারে। পুলিসের মুখোমুখি—প্রত্যেকটি মূহূর্ত কি গম্ভীর !

পুলিসের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে উঠলো একজন সুন্দর যুবক। তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে বললে, "না, আমরা যাবো না। আমরা মুক্তি আদায় করে নিতে এসেছি।"

মার্চমাসের সূর্যের তাপে বরফ আবার গলতে শুরু করলো। মিছিল আবার উদ্দাম হয়ে উঠলো—

কেউ কেউ প্রশ্ন করলো, "কে, কে, ওকে ?"

আইভান উত্তর দিল, "জানো না—ও ষ্ট্যালিন। আমরা ডাকি 'শোশো' বলে।"

জনস্রোত চঞ্চল হলো। শিকারীর গুলি ছুটলো—এতগুলো শিকার সেনাপতি কখন ছেড়ে দিতে পারে ! আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে শ্রমিক। বাটুমের পথে রক্তের বন্যা। জবাব দিল শ্রমিক। পথের পাথর আজ তাদের হাতিয়ার হয়ে উঠলো।

কালানডেনড আহত হয়েছে। অঝোরে রক্ত ঝরছে। কে যেন একজন তাকে বাইরে নিয়ে এলো। আহত কালানডেনড। তবু সে ম্লান হেসে বললো—"শোশো ?"

"হ্যাঃ বন্ধু, খুব লেগেছে ?"

"না ও সেরে যাবে।" একটু চুপ করে বললো, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"হাসপাতালে"—

* * *

বাটুমের শ্রমিক হার মানে নি। বিপ্লবের গৌরবে তারা শহিদের স্মৃতি উদ্‌যাপন করবে। বুড়ো আইভানের অবধি চোখ জ্বলছে। সে তার ছেলেকে ডেকে শোনাচ্ছে, "ষ্ট্যালিন কি বলেছে জানিস? এই পড়—। 'সত্যের জন্য ওরা প্রাণ দিয়েছে ওদের সম্মান দাও। মৃত্যুর করুণ ওষ্ঠে ওরা বিপ্লবের গাণ গেয়ে গেছে—ওদের সম্মান দাও। এখনো যারা আমাদের কানে কানে কথা বলছে—প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই—ওদের সম্মান দাও।' পড়তে পড়তে আইভানের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ নাচল। ছেলের হাত ধরে আইভান বলে ওঠে—"হ্যাঁরে দেবো।"

* * *

১৯০৪ সাল। নেতালিয়া কিরেটেজের কাজ আজ খুব সকাল সকাল সারা হয়ে গেছে। তার শরীরটাও খুব ভাল লাগছে না। বরফ পড়েছে—ঝড়ের আভাস চারিদিকে। বাইরে বাইরে ঘুরে মাথার চুলগুলো ভিজে গেছে। আজ কেবল তার মনে পুরাণো দিনের কথা গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্টোভটার পাশটায় গিয়ে নেতালিয়া বসে ভাবছে। সারা মুখে আগুনের ছোপ্ লাগছে—। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়লো।

"তাড়াতাড়ি দরজা খোল নেতালিয়া," বাইরে থেকে ভেসে আসে কণ্ঠস্বর।

"কে ? তুমি কে ?" নেতালিয়া উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

চুপি চুপি উত্তর আসে, "আমি শোশো।"

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কথা। নেতালিয়া চিৎকার করে ওঠে, "ওসব চালাকি এখানে চলবে না। শোশো এতক্ষণ সাইবেরিয়ার নির্বাসনে রাত্রের ঘুমের যোগাড় করছে।"

শেষে এল বিপ্লবীদের সংকেত চিহ্ন। এবার সে একেবারে বোবা হয়ে যায় বিস্ময়ে। দরজা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শোশো নিজেই দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ কেটে যায় চুপচাপ। নেতালিয়ার দু'চোখে জ্বলে কৃতজ্ঞতা। বলে, "এখানে এলে কি করে ?"

শোশো সোজা উত্তর দেয়, "কেন, পালিয়ে !" নেতালিয়া চুপ করে থাকে।

শোশো বলে চলে, "সেই ১৯০২ সালে আমাকে ধরলো। তার পরে এ জেল থেকে সে জেলে, এমনি করে চরিয়ে নিয়ে বেড়াল। অবশেষে আনল নেভাদা উদায়। কে আর তখন আটকে থাকে বলো। পালালুম।" একটু চুপ করে থেকে বলে, "জানো, এবার লেনিনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। না—না, আমি তাকে চোখে দেখিনি। তার লেখা একটা চিঠি পেয়েছি। এই দেখো—।" শোশো লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা ছোট চিঠি বার করে "ছোট্ট চিঠি। কিন্তু আমার কাছে এ যে কত মূল্যবান। সঙ্গে করে এ নিয়ে

ঘোরার বিপদ আছে জানি, তবু এ আমি পোড়াতে পারবো না।" শোশোর দু' চোখ যেন জ্বলে উঠলো।

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো শোশো—"চললাম নেতালিয়া।"

"এখন কোথায় যাবে ?"

"টিফলিস। মাঝে মাঝে আসবো তোমাদের কাজকর্ম দেখতে।"

অন্ধকারে শোশো মিলিয়ে গেল।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী। গোটা রাশিয়ার কাগজে কাগজে মোটা মোটা হরফে ঘোষণা—"রাশিয়ার উপর জাপানের অতর্কিত আক্রমণ।" দেশ রক্ষার জন্য জারের উদাত্ত আহ্বান। রাস্তার মোড়ে মোড়ে হকারের চিৎকার "জোর খবর।" খবর আর এমন কি—এ কথা তো জানাই তবু হু হু করে কাগজ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় ভিড় বেড়ে চলেছে। সবার মুখে ফুটে রয়েছে আশঙ্কা। তবু বিরক্তিতে হৃদয় তাদের পূর্ণ। একজন বলে উঠলো, "নিজের লোভের জন্য দেশ বিকিয়ে দেবে, তারপরে আবার আহ্বান—পিতৃভূমি।" লোকটা মুখ বিকৃত করে মাটিতে থুথু ফেললো। বাকি লোকগুলো হেসে উঠলো। রেশ টেনে টেনে হকার বলতে শুরু করলো, "না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল আবার বলে পিতৃভূমি। মেনসেভিকরা ওই ধ্বো তুলেছে। কাগজটা পড়েই দেখুন না।" লোকগুলো

হেসে ওঠে, বলে, "পড়তে হবে না। চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি।"

রাস্তায় চলমান জনতা। বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকবার উপায় নেই। চলতে চলতে তবু ভেসে আসে টুকরো কথার রেশ—"তবু মেনসেভিকরা কেন, ট্রটস্কিও ওই কথা বলেছে। বললে কি হবে, লেনিন আছে। ঠাণ্ডা করে দেবে।"

—"পারিনে ভাই আজ কাল। জমিদার, মহাজন, তার ওপর আবার বিদেশ বিভুঁইএর কলের মালিক শুষে দেশটাকে খাক্ করে ফেললে।"

"আরে শুনেছো? বাকুতে সে আবার লাগলো।"

"চাষা গুলোতো আবার আজকাল মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে।"

"কি যে হবে ঠিক বলা যাচ্ছে না। R. S. D. L. P. এর ভেতর আবার ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। বলসেভিকদের কোণ ঠাসা করবার জন্য সবাই উঠে পড়ে লেগেছে।"

জনতা চলে যায়। হকার আগের মতন আবার তার-স্বরে চিৎকার করে। কেউ কারো দিকে খেয়াল করে না। জারের রাশিয়া দুপুরের ঘামে নেয়ে উঠেছে। শোষিত মানুষ খেটে চলেছে—অসন্তোষ পাখা মেলেছে।

"বাকু, বাকু, বাকু" ঘুমের ঘোরেই চিৎকার করে ওঠে মারিয়া।

মাঝরাতে মেয়ের অমন চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় মার। বলে ওঠে, কিরে খুকু, অমন করে চিৎকার করলি কেন?"

বিছানা থেকে ঘুম—মাখা চোখে মারিয়া তখন সোজা হয়ে উঠে বসেছে। একটু হেসে উত্তর দেয়, "ও কিছু না মা—। ও স্বপ্ন!"

"স্বপ্নে বাকু? অদ্ভুত? লেখা পড়া শিখে দিন দিন যে কি হচ্ছ। যত সব বাজে বই পড়ে আর ভেবে মাথাটার একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়লি—মা বকে ওঠেন। "যা চোখে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়।" মারিয়া হেসে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে চুপি চুপি বলে, "জানো মা, বাকু, বাকুতে আমাদের স্বপ্ন প্রথম সফল হবে।"

মা অবাক হয়ে যায়, বলে, "কিসের স্বপ্নরে।"

"তুমি কিছু জানো না মা," ঠোঁট উলটিয়ে মারিয়া বলে ওঠে। "বাকুতে মজুররা হরতাল করছিলো এই প্রথম। মালিক নেমে এসে আপোস করতে বাধ্য হয়েছে। এবার বিপ্লব।" শোশো বলেছে, এখান থেকেই—" মা আকাশ থেকে পড়লো। ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, "ভদ্রলোকের মেয়ে এমন অসভ্য দলের খোঁজ রাখ কবে থেকে? দাঁড়াও কাল থেকে বাড়ির বাইরে যদি গিয়েছ—" মা রেগে খেই হারিয়ে ফেলে।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে মারিয়া কলঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

* * *

ট্রানস্ ককেসিয়ায় বলসেভিকদের এক মিটিং বসেছে আজ। সবার মুখ ভার, দেখেই মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে রীতিমত যুদ্ধ চলেছে। বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চাই, নীতি—

গত ঐক্য চাই, মার্কসবাদের প্রসার চাই—মাথায় সিদ্ধান্ত গুলো ঘুর পাক খাচ্ছে। কিন্তু কি করে হবে সেই মার্কস-বাদের প্রসার? কেমন করে বললে লোকে চট করে ধরে নেবে মজুররা সহজেই বুঝতে পারবে? যদি তারা গিয়ে প্রচার করতে শুরু করে, "আগে পরিবর্তন হয় মানুষের বাস্তব অবস্থা, তারপরে পরিবর্তন হয় তার মনের—তা হলে কেউ তার কথা না শুনে মার দিয়ে তাড়িয়ে দেবে!

শোশো অনেকক্ষণ থেকে এ অবস্থা লক্ষ্য করছিলো। তারপরে হেসে বললো, "আরে, ওই পাশের বাড়ির লোকটার কথা ধর না কেন। সেত আগে ছিল একজন মধ্যবিত্ত। ছোট্ট একটা দোকান ছিল তার। তারপরে প্রতিযোগিতার ঠেলায় দোকানটা আর টিকলো না—উঠলো। তার পর সে কাজ নিল এক কারখানায়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকলো টাকা কড়ি জমিয়ে সে আবার কেমন করে একটা দোকান ফাঁদতে পারে। মনটা তার ছিল এক জন মধ্যবিত্তের, অবস্থা হয়ে গিয়েছিল এক জন শ্রমিকের। তারপরে তার আবার পরিবর্তন হ'ল এ থেকে তো বেশ বুঝা যায়, মানুষের রাজনীতির ভাবধারা কৃষ্টি, যা কিছুই বল না কেন সবার মূলে রয়েছে তার বাস্তব অবস্থা—অর্থনৈতিক পটভূমি। সুতরাং কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পেলেই দেখতে হবে তার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

কিন্তু আর একদল বন্ধু আছেন তারা বলে বেড়ান, "মানুষের রীতি নীতি তার খাওয়া পরার ওপর সব

সময় নির্ভর শীল।" তারা বলেন এটা নাকি মার্কস বলেছিলেন নিজে। চেপে ধরে তাদের বলো—মার্কসের একটা লাইন দেখিয়ে দাও যে এ মতবাদকে সমর্থন করবে। অমনি তাদের মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। আসলে মার্কস বলেছিলেন অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষের নীতিকে নির্ধারণ করবে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা আর খাওয়া পরা কি এক কথা হলো?"

এক জন সভ্য বলে উঠলো তা, এমন ভাবে নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারলে কাজ হবে। অন্যদিক থেকে আর এক জন বলে উঠলো "তা হলেও, শোশো যেমন বললো এমন আমরা কি বলতে পারি? এত সহজ করে?"

মিটিং চলতে থাকে।

* * *

বাকুর শ্রমিক পল্লীতে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। কারখানা ফেরতা মানুষের গলায় আজ নোতুন আওয়াজ ভেসে আসছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও আজ আর কান্নাকাটি হুড়োহুড়ি নিয়ে সারা পাড়াটা তোলপাড় করছে না। ঝোপটার পাশে আগুণ জ্বালিয়ে সবাই গোল হয়ে বসে আজকে গল্প করছে—গল্প। স্তব্ধ পাড়াটায় একটা কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠছে। সবাই চুপ চাপ, নিশ্বাস অবধি যেন বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা বলছে,—"সে দিন রোববার আমরা সবাই পথে নামলাম। যাবো—জারের প্রাসাদে। আমরা হাতে করে দেবো আমাদের আবেদন, নিবেদন

করবো আমাদের দৈন্য, প্রার্থনা করবো এথেকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে।" লোকটি একটু থামলো। আপন মনে যেন আউড়িয়ে নিল। "বেশ মনে পড়ে সে দিন ৯ই জানুয়ারী। আমরা নাম দিয়েছি 'রক্তাক্ত রোববার।' বলসেভিকরা বলেছিল,—'তোমরা এমন ভাবে যেও না। ওরা হয়ত গুলি চালাবে।' আমরা অবাক হয়ে গেলুম। বললুম কেন? আমরা তো কোন গোলমাল সেখানে করছিনে। জারের ছবি পোষ্টারের মত করে নিয়ে চললো আমাদের মিছিল, নিস্তব্ধ মিছিল। পায়ে পায়ে যেন শহর ভেঙে পড়লো। যে দিকে তাকাই সে দিকে কেবল মাথা। বুকের ভেতর আশা নাচছে। জার আসবে, আমাদের কথা শুনবে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। চমকে উঠলাম। জারের সৈন্য গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে।" তারপরে কান্নায় ডুবে গেল লোকটার কণ্ঠস্বর। "কোন রকমে বেঁচে এলাম। সে দিন দেখেছিলাম একমাত্র বলসেভিকরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।"

কারো মুখে কোন কথা নেই। একজন যুবক গা দুলিয়ে বলে উঠলো "আচ্ছা শুনেছিলাম, কৃষ্ণসাগরে না কোথায় জাহাজের সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিলো! তাদের কি হলো! এখনো লড়াই করছে!"

"না, তারা আর বেশি দিন লড়তে পারলো কই! তবে তারা লড়েছিলো। জারের দেওয়া কামান জারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলো। বলসেভিকরা বলেছিলো এর সঙ্গে আমরাও

এস যোগ দেই। কে শোনে তারা কথা? জার পাঠাল আর এক নৌবহর। গোলায় গোলায় রাত্রির মুখ ঝলসে গেল। পারবে কি করে? হয়ে গেল!"

সবার বুক থেকে নেমে এল এক সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস। আলোর শিখাটা উঠলো কেঁপে। "তবু" লোকটা আবার শুরু করে। "আমরা জিতবো? ষ্ট্যালিন সেদিন আমাদের এক মিটিং এ বলেছিলো আমাদের হারানোর কিছু নেই। সত্যিই তো কি হারাবো?" তারপরে একটু তীক্ষ্ণ হেসে বলে উঠলো লোকটা, "হারাবো অনাহার, ওষুধের অভাবে আর মরবো না, বাচ্চাদের আর না খেতে দিয়ে মারতে পারবো না। সত্যিই কি সুন্দর জিনিস আমরা হারাবো।" গভীর দুঃখেও লোকগুলো অল্প হেসে উঠলো।

আগুনের শিখা জ্বলছে। লোকগুলোর মুখ জ্বল জ্বল করে উঠছে। মন্থর সন্ধ্যা ভারী হয়ে উঠলো। লোকটা গুণ গুণ করে গাইতে শুরু করলো—"সময় বয়ে যায়, কমরেড সময় বয়ে যায়।"

হঠাৎ যেন আগুণ ধরে গেল। সবাই এক সঙ্গে গাইতে শুরু করলো। অখণ্ড স্তব্ধতার বুকে প্রত্যেকটা বলিষ্ঠ শব্দ আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো। শিথিল সন্ধ্যার রূপ গেল পালটে। চোখের আলো গুলো এক সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলো।

গান শেষ হলো—রেশ তখনো কানে এসে বাজছে। এবার সবাই চুপচাপ। মাঝখান থেকে একটা ছেলে বলে

উঠলো, "আলভায় এ গানটা লেখা থাকতো। ষ্ট্যালিনের কাগজ 'আলভা'। সত্যি সত্যি নামের সাথে মিলে যায়— বিদ্যুৎ।—আচ্ছা, তুমি তো শোশোর দলের লোক?

লোকটা হেসে জবাব দেয়, "হ্যাঃ।"

"আচ্ছা বলতো, ওরা কেমন ভাবে আলভার ছাপাখানার সন্ধান পেল?"

"কেমন ভাবে পেল তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে গুপ্তচরেরও অভাব নেই। ছাপাখানাটা ছিল শহরের হাসপাতালের কিছু দূরে, রোসটমাসেভেলির এক বিরাট বাড়ি ছিল। খালি বাড়ি, কেউ থাকতো না। আমাদের ছাপাখানাটা ছিল তারি তলায়—প্রায় ৫০ ফুট তলায়। ওঠা নামা করার জন্য ছিল একটা দড়ির সিঁড়ি। সে খানেই কাগজপত্র ছাপানো হত। তিন রকমের কাগজ আমরা বার করতুম। একদিন রাত্রে সৈন্য এসে হাজির। একেবারে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ভেতরে ঢুকে সব তছনছ করে দিল। চব্বিশ জনকে ধরে নিয়ে গেল। তবু ভাগ্য ভালো, ষ্ট্যালিন সেদিন ওখানে ছিলো না।" লোকটা আবার থামলো যেন একটু দম নেবার জন্য। ওদের ভেতর থেকে একজন এবার বললে, "তা আর আমাদের মারামারি করতে হবে না। এবার নাকি আমাদের ডুমা স্বাধীনতা না কি দিয়েছে—।" লোকটা খুব বিজ্ঞের মত বলে উঠলো।

"ও, তোমাদের এখানে অবধি এ বিষ ছড়িয়ে পড়িয়েছে? স্বাধীনতা দিয়েছে?" লোকটা যেন জ্বলে উঠলো।

"দিয়েছে এক বস্তু তার নাম দিয়েছে ডুমা—গণপরিষদ। কিন্তু সেই "গণ" কোথায়? যাদের টাকা—পয়সা আছে, লেখা-পড়া জানে তারাই ভোট দিতে পারবে। তোমার আমার তো সে বালাই নেই। তাই তোমার আমার দুঃখ কষ্টের কথা কে বলবে? ওই বড় লোকেরা? তোমরা বিশ্বাস করো?"

"না, তা সে, বড় লোকেরা আমাদের কথা বলতে পারে না বুঝতে পারে?" লোকটা আম্‌তা আম্‌তা করে বলে।

"তাই বলো। আর ওরা যদি স্বাধীনতাই দেবে তবে এখনো আমরা না খেয়ে মরছি কেন? আসল কথা তা না। ব্যাপার হলো, কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমরা সারা রাশিয়াটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলাম। মস্কৌ, কিয়েভে আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। দেশময় হরতালের বন্যা ডেকেছিলো। রেলগাড়ি বন্ধ। হরতাল ভাঙার জন্য সৈন্য পাঠাতে পারে না। সবাই জোর গলায় কথা বলতে শুরু করেছে। সবাই বলছে, আমার অধিকারের ওপর, জার তোমার কোন কথা চলবেনা। । কারখানার কুলি, মাঠের চাষা, স্কুল কলেজের পড়ুয়া আর মালিকের কারখানার দশ পাঁচটার মাছিমারা কেরাণী সবাই এক হয়ে গর্জে উঠেছে 'হয় মুক্তি নয় মুক্তি'। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। মালিকের রাতে ঘুম হয় না। আমরা যদি এমনি দুর্বার বেগে দুর্দাম হয়ে ছুটে চলি তাহলে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবো ওদের। ওদের স্বার্থে ঘা লেগেছে। তাই

তারা দিল গণপরিষদ। তার ভেতর আমাদের কোন হাত নেই। উদ্দেশ্য হলো আমাদের পুরাণো ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে আমরাই দুর্বল হয়ে পড়বো। তখন সেই গ্রে হাউণ্ড খুঁজবে আবার ৯ই জানুয়ারী। কিন্তু এ ধোঁকায় শ্রমিকরা ভুলবে না। মস্কো শ্রমিকরা কি গান গায় আজকাল জানো? তারা বলে,

"ভয় পেয়ে জার করলো জারি ইস্তাহার
মৃত্যুর জন্য স্বাধীনতা জীবন্তের এই কারাগার।"

"ষ্ট্যালিন কি বলেছেন জানো?" লোকটা পকেট থেকে একটা ইস্তাহার বার করে পড়তে থাকে। শোন, "আমরা যদি শ্রমিক শ্রেণীর চুড়ান্ত বিজয় চাই তা হলে আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সংঘবদ্ধ এবং সচেতন প্রত্যেক শ্রমিককে এই রুশব্যাপী বিপ্লবের নেতৃত্ব নিতে হবে।" লোকটা এবার হাসলো; শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো।" সবাই বলে উঠলো—"না, নেই।"

"তা হলে আমাদের কাজ হচ্ছে এমন একটা জায়গা বেছে নেওয়া যেখানে আক্রমণ করা যাবে—"

মিটিং চলতে লাগলো।

* * *

তখন ককেসাসের অন্য প্রান্তে আর একটা মিটিং চলেছে। পার্ক ভরে গেছে মাথায় মাথায়। পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের দেওয়াল। মাইক্রোফোন গর্জন করে চলেছে। মানুষের

কলতান ক্রমশই যাচ্ছে বেড়ে। একটা কিছুর প্রত্যাশায় সবাই যেন দুলছে। বক্তা গর্জন করছে, মাইক্রোফোন কথা গুলোকে ছুঁড়ে দিচ্ছে মানুষের কানে, দেওয়ালের কোণে, আকাশের বুকে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'একটা হাততালি। "লেনিন, লেনিনই একমাত্র লোক যে দেশকে নিয়ে চলেছে আসন্ন ধ্বংসের মুখে। বিপ্লব! বিপ্লব! কথা গুলো খুব সুন্দর! বোকা লোকদের ঠকানোর জন্য ঐ কথা গুলো খুব কাজে লাগবে। দূরে সাজানো রয়েছে জারের সাঁজোয়া বাহিনী। আর্মাড কার বুকের উপর গর্জন করছে। এ অবস্থায় কে বিপ্লবের কথা বলতে পারে? কে বলতে পারে, মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে? সে কি আপনার বন্ধু? লেনিন, লেনিনই এ কথা বলে। লেনিন বলে 'অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ কর।' সেই লেনিন কি আপনার বন্ধু? পারবেন আপনারা শক্তিমান জারের বিরুদ্ধে লড়তে? কিন্তু আমরা, মেন-সেভিকরা, আমরা চাই শ্রমিকের মুক্তি—তাদের মৃত্যু নয়। তাই আমাদের অনুরোধ আপনারা অস্ত্র ফিরিয়ে দিন—"

মঞ্চের কাছেই গোলমাল। মারামারির সূচনা। এক কোণ থেকে অন্য কোণ অবধি ধ্বনিত হচ্ছে "বলতে দিন, বলতে দিন। শুনতে চাই না।" স্রোত বইতে শুরু করছে, নদী গান গাইছে। সভার কর্মকর্তারা বিব্রত হয়ে পড়ে। মাইক্রোফোন কথা বলছে কানে যাচ্ছে না। মানুষের গর্জনের তলায় তা ডুবে গেছে।

শেষে বলতে দিতে হলো। এ-কথায় সভার এ কোণ ও কোণ অবধি হাততালি ফেটে পড়লো—।

"কে? কে? ওকে?"

"আরে দেখেই বুঝতে পারছ না? ও ষ্ট্যালিন।"

"ষ্ট্যালিন, ষ্ট্যালিন, কমরেড ষ্ট্যালিন জিন্দাবাদ।"

মাইক্রোফোন আবার কথা বললো। মানুষ চুপ করলো। কথা, খুব সামান্য কথা। অথচ মুখর। "ভাইসব। আপনাদের একটা খুব বড় বদ্ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—সব কথায় হাততালি দেওয়া। যে কেউ আসুক না কেন, যে ছাই পাশই বলুক না কেন, আপনারা হাততালি দিয়ে উঠবেন, সে যদি বলে, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', আপনারা হাততালি দেবেন। আবার সে যদি বলে 'অস্ত্রত্যাগ কর, তা হলেও আপনারা হাততালি দেবেন। এমনিভাবে আপনারা সমর্থন করেন—এ বিষয়ে আপনাদের সাবধান হওয়া উচিত।

"অস্ত্র ভিন্ন কেমন বিপ্লবী হয় তা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে বুঝিয়ে গেলেন, তিনি বোধহয় ঋষি টলস্টয়ের দলের লোক, বিপ্লবী নন। তিনি যাই হোন না কেন তিনি বিপ্লবের শত্রু—স্বাধীনতার শত্রু—"

স্পষ্ট অনুত্তেজিত কথাগুলো। প্রত্যেকটি শব্দ যেন সোজা বর্শার মত, প্রত্যেকটি কথা বুকে গিয়ে বিঁধছে। জনতা-প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মাইক্রোফোন তখনও থামে নি। "বিপ্লবের সফলতার জন্য কি চাই আমাদের? তিনটে জিনিস—প্রথম অস্ত্র, দ্বিতীয় অস্ত্র; তৃতীয় অস্ত্র"

উদ্দাম হয়ে উঠলো মানুষ। জন সমুদ্র ফুলে উঠলো দুর্দমনীয় ঘৃণায়। জারের সাথে আপোষ নয়, তার আমুল উচ্ছেদেই একমাত্র মুক্তি। রাশিয়ার শ্রমিকরা কিছুতেই ভয় পেয়ে হটে আসবে না—ওই জানুয়ারীর রক্তাক্ত দিনকে কিছুতেই ভুলবে না। মানুষের গলায় গান ভেসে উঠলো—

"জাগ জাগ জাগ সর্বহারা
অনশন বন্দীক্রীতদাস - "

* * *

ফিনল্যাণ্ড, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর। এখানে বসেছে সমস্ত বলসৈভিকদের কনফারেন্স। রাজনৈতিক প্রস্তাব রচনার ভার ষ্ট্যালিনের ওপর। খুব ব্যস্ত। এত কাজের ভেতর তবু তাঁকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

কনফারেন্স চলছে। হঠাৎ খবর এলো মস্কৌতে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে। লেনিনের আদেশ এলো, "কনফারেন্স ভেঙে দাও। প্রতিনিধিরা গিয়ে আন্দোলনে যোগ দাও।"

শেষ হলো কনফারেন্স। ষ্ট্যালিনের মন আজ ভরপুর।—"জীবনে এই প্রথম আমি লেনিনকে দেখলাম। আমার মনের মণিকোঠায় যে মানুষকে বসিয়েছি সবার উঁচু স্থানটিতে তাকে আজ আমি দেখলাম। দেখলাম, সাধারণ গোছের একটা লোক, বেঁটে…

"বড় বড় লোকদের একটা রেওয়াজ—দেরি করে মিটিংএ আসা কিন্তু তিনি এসেছেন সবার আগে। এ কোণে সে কোণে বসে প্রত্যেকটি সভ্যের সঙ্গে আলোচনা করছেন!

"বক্তৃতা তিনি বেশি দেন নি। মাত্র দুটো। কিন্তু সে দুটোই যেন সভার প্রাণ ফিরিয়ে আনলো। কি ভাষার তীক্ষ্ণতা, বিশ্বাসের গভীরতা, যুক্তির ঔজ্জ্বল্য..."

স্মৃতির রাজ্যে ঢুকলো কথার ভিড়।

* * *

"টিফলিসের পথে রক্তের আলপনা কেন? জর্জিয়ার বুক কেন রাঙা হয়ে উঠলো? আমি বুড়ো মানুষ, আমি রাস্তায় এসে দাড়ালুম কেন?" পেট্রফ বলে চলেছে বিকারের ঝোঁকে। পেট্রফ বুড়ো হয়ে গেছে। মস্কো-এর কারখানায় কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেলেছে। বিপ্লবের জন্য সে এগিয়ে এসেছিল পথে। মাথায় চোট লেগে পড়ে আছে। ডাক্তার, কলের ডাক্তার, হুকুম হয়েছে দেখবে না। তাই বিপ্লবীদের ডাক্তার আসে, ওষুধ দেয়, বলে "আশা নেই।"

কিন্তু পেট্রফের আশা এখনো কমেনি। অর্ধোচ্চারিত কথাগুলো ছাড়া ছাড়া। তবু পেট্রফের বিপ্লবী প্রাণ আজ মৃত্যুর সাথে শেষ পাঞ্জা লড়ছে। "পারিনি—আমরা পারলুম না—তবু সময় আসবে।" পেট্রফ থেমে যায়। তার ছেলে গালে একটু জল দেয়—হঠাৎ পেট্রফ উত্তেজিত হয়ে উঠে। শিথিল স্নায়ুকে আবার টেনে চিৎকার করে ওঠে, "শুন্‌লি তোরা শুন্‌লি—মেনসেভিকরা বলে শ্রমিকরা নাকি, নাকি হতাশার ভেতর কি করলো—মজুর মারা গেছে।" পেট্রফ রেশ টানতে থাকে। তার ছেলে এগিয়ে এসে কানে কানে বলে, "না, না ষ্ট্যালিন তার জবাব দিয়েছে। ষ্ট্যালিন বলেছে,

"মরিনি, নতুন ভাবে আক্রমণ করবো, তার যোগার করছি।" "এ্যাঁঃ কি বললি ?" মাথা উঁচু করে উঠে বসতে চায়। ছেলে তাকে ধরে ফেলে বলে উঠলো, "শোন, ষ্ট্যালিন বলেছে—"

"মরিনি না— ? তাইতো মরিনি।" বৃদ্ধ মাথাট্যাকে ছেড়ে দেয়। হঠাৎ আবার মাথা তুলে চিৎকার করে "টিফ্‌লিসের পথে রক্ত মুছে যাবে না। মজুর মরে না—।"

ব্যান্‌ডেজ ভিজে গেছে রক্তে। বুড়োর মুখ দিয়ে নীলাভ ফেনা বেরিয়ে আসছে।

ছোট্ট ঘরে একটা কথা তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে—"মরেনি—মরতে পারে না।"

বাকু

১৯০৭ সালের বাকু। জারের অত্যাচার চলেছে, মালিকের জুলুম চলেছে। বাকুর তেলের খনি ভিজে গেছে শ্রমিকের রক্তে, প্রতিবাদের জবাব। প্রথম বিপ্লব সফল হতে পারেনি। জীবনযাত্রা ক্রমেই উঠেছে জটিল হয়ে। তবু শ্রমিক এখনো জেগে আছে। কালো রাত্রির বুকে এখানে ওখানে এখনও তো একটা প্রদীপ জ্বলছে মিটমিট করে। সাকভেরালিজ প্রাণপণে খাটছে। তার স্বপ্ন বাকুর শ্রমিক আবার মাথা তুলবে। তবু ভরসা পাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে তো আর কাজ ফেলে রাখা চলতে পারে না। এই আলোচনা করবার জন্য সাকভেরালিজের বাড়িতে এই নিয়ে আলোচনা চলেছে। স্টোপানি বললো, "আমরা ঠিক মত অবস্থাকে বুঝতে পারছি না। হেড কোয়ার্টার্স থেকে কোন আদেশ না পেলে কাজে এগুবো কি করে?"

—"সে কথা তো ঠিক। কিন্তু যতদিন সে আদেশ পাওয়া না যাচ্ছে ততদিন কোন কাজ না করলে বাকু থেকে যে পাততাড়ি গোটাতে হবে। একেই তো মেনসেভিকরা ক্রমশই জাঁকিয়ে বসছে। আবার ডুমায় প্রতিনিধি পাঠাতে হবে।"

—"কিন্তু এদের হটাবেন কেমন করে? খোলা খুলি ভাবে কাজ করতে গেলেই তো ধরে জেলে পুরবে।

—"পুরবে বলে কাজ যদি না করি তা হলে বিপ্লবকে পোঁটলা পুরে পুঁতে রাখতে হয়"—সাকভেরালিজ রাগে গর্ গর্ করতে থাকে।

হঠাৎ দরজা খুলে একটা লোক ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো। সবাই চমকে উঠলো। এর জন্য যেন তারা প্রস্তুত হয়ে ছিলো না।

বিস্ময়ে উজ্জ্বল-হওয়া চোখগুলো এক সাথে লোকটার মুখের উপর থমকে দাঁড়াল। —"কি ব্যাপার কি? আপনারা দেখছি আমায় যেন স্বগত করতে পারছেন না?" আগন্তুক হেসে উঠলো।

"না, ঠিক কমরেড, অভ্যর্থনা দিতে পারছি কই! আমরা যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।" সাকভেরালিজও হেসে উত্তর দিল।

ণ আগে পর্যন্ত আমরা অন্ধকার দেখছিলাম। বাকুই বোধহয় বোকা বানিয়ে দিল।"

স্টোপানী বললো, "এখন মনে হচ্ছে আবার চালাক হতে পারবো।

ভরসিলভ এতক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। এই বার সে বললো, "কমরেড ষ্ট্যালিন কতক্ষণ থাকবেন ?"

ষ্ট্যালিন বললো, "কমরেড ভরসিলভকে বোধ হয় এবার আমায় নিরাশ করতে হলো। থাকবো বেশ কিছুদিন, অর্থাৎ যতদিন ধরা না পড়ি।"

—"সুতরাং বাকুতে আমরা আপনাকে পেতে পারি। ধন্যবাদ।"

—"ওটা আমায় না কেন্দ্রীয় কমিটিকে ? তারাই এখানে আমায় পাঠিয়েছেন।"

—ভরসিলভ হেসে বললো, "তথাস্তু"।

ঘরটিও যেন প্রাণ খুলে হেসে উঠলো।

* * *

নেপ আলান কোম্পানীর বিরাট কারখানা। চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, কোন রকমে যেন বাইরের আক্রমণকে প্রতিহত করছে। ভোর বেলায় বাঁশি বেজে উঠলো, ধোঁয়া উড়লো, লোক ছুটলো। কালো কালো ধোঁয়া আকাশের বুকের উপর স্তম্ভের মত উঠছে তার পরে ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছুটছে কলের মানুষ। গেটম্যানের ঘড়ির কাঁটার মিল রেখে চলতে হয়, পায়ের ছন্দও যেন সেই তালেই বাঁধা। তবু চোখের স্বাধীনতা তো এখনও আছে। কালো রং করা দেওয়ালের বুকে ঝুলছে লাল কালির পোষ্টার। পোষ্টার আর পোষ্টার, কেরাণীর মহলে হয়ত বিরক্তি

আসে। মজুর মহলে সাড়া পড়ে। চলমান পা আপনা থেকেই মন্থর হয়ে আসে। উৎসাহ জ্বলে উঠে স্তিমিত চোখে। গেটম্যানের ঘড়ির কাঁটা কিন্তু থামে না। থেমে যায় মজুরের পা। পড়তে শুরু করে,—"খানলারের হত্যার জন্য দায়ী কে?"

প্রশ্ন ভেসে ওঠে, "খানলার, কে খানলার?"

উত্তর দেয় পাশের লোক, "খান্‌লারকে চিনিস নে। আরে আমাদের ইউনিয়নের পাণ্ডা।"

—"লাল ঝাণ্ডার সেই লোকটা—খুব বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত।"

—"তুমি না হয় সুনজরে আছ। তাই অমন অসভ্য কথা বলতে পারো; খানলার যে ইউনিয়নকে তৈরি করেছে।"

—'হ্যাঃ তৈরি করেছে, তা, তার কি হয়েছে;' প্রশ্ন করে আর এক নবাগত।

"খুন, খুন করেছে?"

কারখানাময় একটা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে—"খুন করেছে, খানলারকে খুন করেছে—কে?" এখানে ওখানে ভিড় শুরু করে, আবার ভিড় চলে যায়। গেটের মুখ ভারী হয়ে ওঠে। লোকে লোকারণ্য। খোলা গেট, তবু কেউ যাচ্ছে না। মানুষ যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তারি কিছু দূরে। কারখানার বিরাট বাড়িটা ভয়ে যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে। প্রাণের স্পন্দন নেই। করিডারে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে ম্যানেজার আর মালিক। দূরে খাটিয়ার উপর খানলার শুয়ে আছে, কোমর পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা।

গলার কাছে, বুকের পাশে আঘাতের মুখে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মজুররা চুপ করে আছে। মাঝে মাঝে দু একটা কথা ভেসে আসছে। "কাল রাত্রে ফেরার সময় ওকে খুন করেছে," "ঝোপটার পাশে আজকে ওকে পাওয়া গেল—" বেলা বাড়তে থাকে, গোলমালও যায় বেড়ে। "এমনি ভাবে কতক্ষণ ফেলে রাখবে ? আমাদের জবাব দিতে হবে।"

"১৯০৫ সালের সাথে সাথেই বাকু মরে যায়নি। বাকু জবাব দিতে জানে।" একপাশ থেকে ভেসে আসে কণ্ঠস্বর।

পথ দিয়ে লোক আসে। ছুটে আসে আর একটা ছোট মেয়ে। হাতে এক গোছা ফুল। খানলারের কাছে এসে ডুকরে কেঁদে ওঠে,—"কাকামণি, তুমি কাল ফুল চেয়েছিলে, দিতে পারিনি। আজ এনেছি ওঠ।" মেয়েটা আছড়ে পড়ে খানলারের বুকে।

ওখানেই সভা শুরু হয়ে যায়। সকাল বেলাকার সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে ঝাণ্ডা। একটা ছেলে এ কোণ থেকে সে কোণ প্রচার পত্র বিলি করে বেড়াচ্ছে। সভা গর্জন করে ওঠে, "ষ্ট্যালিনের নির্দেশ, খানলারের প্রতি আঘাত মানেই আমাদের প্রতি আঘাত। হত্যাকারী খানলারকে শুধু খুন করেনি, খুন করেছে আমাদেরও। ওরা মনে ভেবেছে এমনি করে সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর বিভেদ আনবে, শোষণের জোয়াল দেবে আরো শক্ত করে।" সভা এক নিশ্বাসে পড়ে যায় সবটুকু। "আমরা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবো সবটুকু, খানলার শুধু মাত্র একা নয়, তার পিছনে আছে হাজার

হাজার সচেতন মজুর। তারা জানে কেমন করে নিজেদের রক্ষা করতে হয়, রক্ষা করতে হয় তার ভাইদের।”

“হাজার শ্রমিকের এই তো মনের কথা। মজুরের বজ্র-মিতালি স্বার্থের বুকে আঘাত হানবে। এই তো চাই!” সভায় বক্তার আওয়াজ ভেসে আসে। “কমরেড, গতমাসে ষ্ট্যালিন বলেছে আত্মরক্ষা বাহিনী জোরদার করতে। আমরা তো পারিনি। পারিনি, তাই সুযোগ বুঝে শয়তান খুন করতে সাহস পায়। সিংহের বাচ্চা, মজুরের ছেলের গায় হাত তুলতে সাহস করে। খানলারের রক্ত দিয়ে আমরা জোরদার বাহিনী গড়ে তুলবো, শত্রুর বুকে খিল লাগবে। বিপ্লবী বাহিনী জিন্দাবাদ।

সভার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি গর্জন ভেসে ওঠে “জিন্দাবাদ!”

“বন্ধুরা, ভাইরা, আমরা জানি, কারা খানলারকে খুন করেছে। আমরা জানি, তারা কাজ করে এই কারখানায়। যতদিন পর্যন্ত তারা বরখাস্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমরা হরতাল চালিয়ে যাব। খানলারের হত্যার প্রতিশোধ নেবো। খানলার, ষ্ট্যালিনের ভাষায়, ‘সর্বহারা আত্মার আগুনে আর আবেগে, বেদনায় আর বোঝায় গড়া আমাদের খানলার—”

হাজার মজুর দৃঢ় মুষ্টিতে অভিবাদন জানালো, হরতাল,—মিছিল এগিয়ে চলে, পতাকা ওঠে, সবার আগে খানলারের মৃতদেহ।

আকাশে বাতাসে শ্লোগান কাঁপছে, "প্রতিশোধ চাই।"

বাকুর বুকে সন্ধ্যার কালো ওড়না। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। ভেটসেক্ ঘরে চুপ করে বসে রয়েছে। সামনে খোলা পড়ে রয়েছে একগাদা খবরের কাগজ। ভেটসেক একটাকে তুলে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শুধু একবার। জামার হাতায় চোখ মুছে ভেটসেক অল্প জোরে পড়তে লাগলো—

"রাশিয়ার বিরাট বিপ্লব এখনো শেষ হয়ে যায় নি। না শেষ হতে পারে না। বিপ্লব এখনও জীয়ন্ত। আমরা একটুখানি মাত্র পিছু হটে এসেছি, আমরা শক্তি সংগ্রহ করছি শেষ আঘাতের জন্য।

"বিপ্লবের প্রাণ শক্তি সেই কৃষক মজুর এখনও প্রাণভারে টলমল করছে। তারা কখনও তাদের মুল দাবীগুলোকে ত্যাগ করতে পারে না—না, তা কখনই পারে না।

"আমরা এখন নোতুন তুফানের বুকের উপর বসে আছি। আমাদের সামনে এখনও রয়েছে সেই পুরাতন সমস্যা—জারের উচ্ছেদ।

"এখনই আমাদের কর্তব্য, আমাদের জাগ্রত সচেতন বিপ্লবীদের, এক হওয়া। ঐক্য আমাদের প্রয়োজন স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের জন্য, সর্বহারার মুক্তির চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্য।

"১৯০৫ সালের মত এবারেও আমাদের সামনে এসে পড়েছে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার।

"সেই বিপ্লবের জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পার্টি। তাই আমার বন্ধু পাঠক, শেষ সংগ্রামের জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুত করুন।"

ধরা গলায় গুম্ গুম্ আওয়াজ হচ্ছে। "তা ঘরে বসে কাগজ পড়লেই বুঝি প্রস্তুতি আসবে, কমরেড পাঠক—!" ঘরের ভিতর পা দিয়ে সেরাটভ বলে ওঠে। "কিন্তু বন্ধু, ওই বেআইনী কাগজগুলো ঘরময় ছড়িয়ে রাখলে বিপ্লব তাড়াতাড়ি আসবে না। হ্যাঃ, সুবিধা হবে, বাটুমের জেলে বসে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দিন কাটানো যাবে। অথচ সে যে কাজের কথা প্রচার করতে বলছে জেল দরজার শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে—তার একটিও হয়ে উঠবে না।" সেরাটভ নিজেই দরজা বন্ধ করে দেয়। ভেটসেক্ এবার অপ্রতিভ হয়ে যায়। তবু বলে ওঠে, "বেশ আমার না হয় একটুখানি ভুলই হয়ে গেছে, তা বলে তুমি আমায় অতবড় কথাটা বলতে পারলে।"

"রাগ করো না, বন্ধু!" সেরাটভও ব্যথিত হয়ে উঠে বলে,—"একটুখানি কড়া কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু তোমার অপরাধ তো কম নয়। ট্রটস্কি আর মেনসেভিকরা বলেছিলো, কি হবে দাও পার্টি তুলে। জারের এ অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। ষ্ট্যালিন তখন কি লিখেছেন মনে আছে তো?—'আমার মনে হয় লেনিনের মতই একমাত্র সত্য-পথ। ট্রটস্কি যে ব্লকটা তৈরি করেছে তার ভিতর নীতির কোন বালাই নেই।'

"কিন্তু জেলে বসে জিনিসগুলোকে কি পরিষ্কার দেখতে পান। আমরা বাইরে থেকেও বুঝতে পারি না—"

"আর ঠিক সেই জন্য তো আমারা সবাই ষ্ট্যালিন হয়ে যেতে পারি না।"

দু'জনেই হেসে ওঠে। তারপর চুপ চাপ্। বাইরের বাতাস লেগে আলোর শিখা কাঁপছে, ওদের বুকের ভেতর তোলপাড় করছে স্মৃতি। এই সন্ধ্যায় যেন পেয়ে বসেছে চাপা দেওয়া কথাগুলো।

ভেটসেক আপন মনেই বলে ওঠে,—"জোসেফ গিয়েছে সেই ১৯০৮ সাল—আর আজকে ১৯১০।"

—"ভুল হ'ল। এতদিন একটানা নয়। বেইলভ জেল খানায় কেটেছে মাত্র মাস নয়েক! তারপর হুকুম হলো—ভোলোগডায় নির্বাসন। কমরেড বন্ধু ১৯০৯ সালের গরম কালেই পলাতক। ১৯১০এর মার্চে আবার ধরা পড়ল, তারপরে আবার নির্বাসন—বে-আইনী কাজে একেবারে পোক্ত—তাই চায় বে-আইনী পার্টি।"

আবার দু'জনে হেসে ওঠে।

"—কিন্তু জানো আমার বিশ্বাস ষ্ট্যালিনকে যদি আমরা অত ঘোরাফেরা না করতে দিতাম তা হলে বোধ হয় আবার ধরা পড়তো না। কোথায় টিফ্লিস, কোথায় বাকু, সব জায়গায় ষ্ট্যালিন। আজকে এখানে বক্তৃতা কাল ওখানে, পরশু মেনসেভিকদের সঙ্গে তর্ক, সব জায়গায় তাকে চাই। আমাদের স্বার্থপরতার জন্যই তো হলো—"ভেটসেকের

গলা আবার ভেঙে পড়লো। সেরাটভ এবার ভেট্‌সেকের কাছে এল। তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললে, "ছিঃ।"

হঠাৎ সেরাটভ প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা তোমার মনে পড়ে ১৯০৮ সালের কথা,—বাকুতে হরতালের বাণ ডেকেছে। মেনসেভিক, সোশ্যালিষ্ট সবাই বাধা দিচ্ছে। তবু তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা কেমন জয়ী হলাম।" গল্পের গতিটা ফিরিয়ে দিয়ে সেরাটভ বলে যায়, "আজ আমার সেই কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। জেলের ভিতর রাজবন্দীদের উপর হুকুম চলেছে, রোজ রোজ নতুন করে। ষ্ট্যালিন সে সময়ে বলে,—'এর প্রতিবাদ করতে হবে।' সমস্ত বন্দীরা এসে যোগ দিল। ক্রমেই বেড়ে চলে সেই আন্দোলন। জেল দারোগা ডেকে পাঠালো এক সৈন্যদল—বলে এদের শায়েস্তা করবো। বন্দীদের সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলে। দৈত্যেরা চালালো রাইফেলের বাঁট। ষ্ট্যালিন তখন সবার আগে এল—হাতে কার্ল মার্কসের একখানা বই।

"১৯১১ সাল। সাইবেরিয়ার বরফের বুকে ছোট ঘর যেন হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে গিয়েছে। এখানে অনেক লোক থাকে, ঠাসাঠাসি করে আছে, তবু হাসির ফোয়ারা ছুটছে। একটা গায়ের কাপড় জন চারেক এক সঙ্গে গায় দিয়ে টানাটানি শুরু করেছে—

"ওরে, বোকারা, এত টানাটানি করলে যে ওটা আর আস্ত থাকবে না; তোদের কেউ গায় দিতে পাবিনে,—শীতে কাঁপবি—। বোকার দল!"

গায়ের কাপড়ের একটা লোক বলে উঠলো ;—"তা দাদা, কোণটায় বসে মোটা কোট গায় দিয়ে কথাগুলো বেশ শোনাচ্ছে—! তা বোকা বুঝলেন আপনি।"

"ভাবছি বুদ্ধিমান ষ্টিলোপিন যে কবে বুঝবে—।"

—"আঃ, এতক্ষণ ষ্টোভের ধারে বসে কফির পেয়ালা—"

লোকটার অঙ্গভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো।

বাইরে বরফ ঝরছে। তার উপর দিয়ে ভাসচে ভারী বুটের মচ্ মচ্ শব্দ, ঘরের ভিতর সবাই সচকিত হয়ে উঠছে—।

"তা হলে চিজিকভ্ এবার আমাদের মায়া কাটালো—।" ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। আবার সবাই হেসে ওঠে। "চিজিকভ্ বোধ হয় এখন প্রাগ কনফারেন্সে বক্তৃতা দিচ্ছে—।"

আর একজন বন্দী ঘরের কোণ থেকে একটা চিরকুট কুঁড়িয়ে নিয়ে অল্প আলোতে মেলে পড়তে চেষ্টা করে।—"ছ' মাসের মধ্যেই আমার মুক্তি। তারপরে আমি আপনাদের কাছে ফিরে যাব। জনসাধারণের প্রয়োজন যদি হয় খুব বেশি, তাহলে আমি এখুনি চলে যেতে পারি—।"

অল্পদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ কর্তাদের বাড়ি সোজা হয়ে। জানলাগুলো বন্ধ। তবু স্টোভ ঠাসা ঘরে মন ঘুরে চলেছে। আজ ওখানে সাড়া পড়ে গেছে। বড় কর্তা এসেছে। ময়লা জমা তকমার উপরে দ্রুত হাত বুলিয়ে নিলেও ধুলোর রেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনভ্যস্থ পা বরফের উপর দাপাদাপি করছে—দারোগার তীক্ষ্ণ হুইসিল ছুটাছুটি করছে তবু লেফট্

রাইটের তালে পা আর মুখ মিলতে পারছে না—এই ঠাণ্ডা-তেই ছোট দারোগার ঘাম ঝরছে। পুলিসের বড় কর্তা—"চাকরি বুঝি আর থাকলো না।"

ঘরের ভিতর আশঙ্কা ঘনায়িত হয়ে উঠছে। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে লেনিনের একটা প্রচার পত্র।

বড় কর্তার চোখ ঘুরছে—। লেনিন বলছেন "এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য কি, তাকে সফল করতেই হবে।"

—"আপনি লোক পাঠিয়েছেন? ষ্ট্যালিন আছে, না পালিয়েছে?" বড় কর্তার আদেশ।

—"আজ্ঞে, আজকে সকাল বেলায় মাত্র এক জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।"

"তার নাম চিজিকভ্। সে সময় সবাইকে দেখা হয়েছে।"

"দেখা হয়েছে, গোনা হয়েছিল?"

—"সে তো ঠিক বলতে পারছিনে।"

"বলতে পারছিনে"—বড় কর্তা খিঁচিয়ে ওঠে। তারপরে হতাশায় ভেঙে পড়ে গলা।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে দারোগার নাকের কাছে ছুঁয়ে দিয়ে বলে, "পড়ুন। কম্পিত হাতে দারোগা সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করে,—"আপনারা সবাই জানেন, এই কনফারেন্স আমাদের পার্টির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এখানে বলসেভিক আর মেনসেভিকদের মধ্যে তফাৎটা ফুটে উঠবে,—গোটা রাশিয়াব্যাপী একটা ঐক্যবদ্ধ বলসেভিক পার্টি গড়ে উঠবে।"

"হ্যাঁঃ এটা তো ষ্ট্যালিন লিখছে। তাতে আর হয়েছে কি ?" —"তাতে আর হয়েছে কি ? সাইবেরিয়ার শীতে আপনার মগজটাও জমে গেল নাকি ?" রাগে পাংশুটে হয়ে যায় বড় কর্তার মুখ। "যান, রেজিষ্টার নিয়ে যান,...নাম ডেকে ডেকে মিলিয়ে নিন্ সবাই আছে কিনা...।" চেয়ারটার পিঠে হেলান দিয়ে আদেশ দেয় বড় কর্তা।

বন্দীর দরজায় আঘাত পড়লো। কথাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। একজন বলে উঠলো,—"কি দারোগাবাবু নাকি ? অসময়ে যে।" দরজা খুলে গেল।

"আরে হাতে আবার খাতা। চিজিকভ্ তো গিয়েছে এখন, আমাদের তো এখন অনেক দেরি।"

"আপনারা সব লাইন বেঁধে দাঁড়ান।" বন্দীদের কোন কথার উত্তর না দিয়ে হুকুম দেয় দারোগা।

"হঠাৎ দারোগা বাবু, এত গম্ভীর কেন ?" বন্দীদের কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্রূপ।

"দেখছেন, সব ঠিক আছে কিনা ?"—"সটকে কেউ পড়েছে নাকি ?"

দারোগার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। "ষ্ট্যালিন, কই ?" "ষ্ট্যালিন কোথায় ?" দারোগা গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সে তো চিজিকভের সঙ্গে বাইরে গেল ওকে বিদায় দিতে। এখনও ফেরেনি তো !"

..."চিজিকভকে যে আমি সঙ্গে গেট্ পার করে দিয়ে এলাম।"

—"জানেন দারোগা বাবু, ও ছোট বেলায় কবিতা লিখতো, বরফ পড়ছে ভাব লেগেছে বোধ হয়—।" বন্দীরা হেসে ওঠে।

কিন্তু দারোগা বাবু বলে ওঠে, "তোমরা তাকে পালাতে সাহায্য করেছো ; ওষুধ দেবো।" দারোগা ছুটে বাইরে যায়।

"গেট ম্যান, পাশপোর্টের অংশগুলো কই?" দারোগা কাঁপতে থাকে।

"আজকে তো একটা মাত্র বেরিয়েছে এখান থেকে, কি চিজিকভ্ নাকি নাম। আর আপনার সঙ্গে একজন গেল তার অংশ তো আমি রাখিনি।"

—"আমার সঙ্গে ? সে তো চিজিকভ।"

—"আমার কাছেও তো আছে চিজিকভের নাম।"

—"তোমার কাছেও চিজকিভ?" তা হলে ষ্ট্যালিন আবার পালালো?" দারোগা বরফের উপর বসে পড়লো।

* * *

সেণ্টপিটারস্‌বার্গে আজ আবার সৈন্যের মহড়া। রাজপথের বুক কাঁপিয়ে জারের সৈন্যের উন্মত্ত পদক্ষেপ। শহরে সাড়া পড়েছে—"আবার নোতুন করে শুরু হবে নাকি অত্যাচারের পর্ব? এবার মরার আগে জবাব দিয়ে মরব, পথ চলতি সব মানুষের মনের কথাই যেন তাই। পাশা একটু দূর থেকে দেখে আর মনে মনে গালাগালি দেয়। পাতলা ভিড় মোড়ের মাথায়,—মুখে খুব বেশি কথা নেই। একটা মোড়ের মাথায় অগ্‌নেভ দাঁড়িয়ে দেখছিলো। পাশ থেকে একটা লোক একটু আত্মীয়তার সুরে বলে ওঠে,

"আজ ষ্ট্যালিন আসছে।" অগ্‌নেভ চমকে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলে, "আপনি কী করে জানলেন? তাঁরি অভ্যর্থনার জন্য বোধ হয় এত আয়োজন। তা, আমার কাছে কেন, থানায় গিয়ে খবরটা দিন।"

"তা আপনি আমার উপর চটছেন কেন? যেটা শুনেছি—" রাধা দিয়ে তীব্র বেগে বলে ওঠে অগনেভ, "হ্যাঁ শুনেছেন, তাই যাচাই করে নিতে চান যাতে বাজে খাটনি না হয়, আবার প্রমোশনটাও এগিয়ে যায়!"

"মানে, আপনি কি বলতে চান? আমি পুলিশের লোক?", ভিড় সচকিত হয়ে উঠেছে। অগ্‌নেভ বলে ওঠে, "ছিঃ, তা কখন হতে পারে, আপনি বিপ্লবীদেরই পক্ষে।" অগ্‌নেভ চলে আসে।

পথে কেবলি মনে হচ্ছে সত্যই কি ষ্ট্যালিন আজ আসছে? মাথার উপরে খাঁড়া ঝুলছে, সব উপেক্ষা করে? না, এ কখনও হতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে—এমনি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অগ্‌নেভ বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। অগ্‌নেভ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, পথের অন্য ফুটপাতটার উপর দিয়ে কে যেন হেঁটে চলেছে। দেখে চেনা বলে মনে হচ্ছে। মুখের ওপর টুপিটা অমন করে টেনে দেওয়া কেন? ওকে যেন কোথায় দেখেছি। চিন্তার স্রোত দ্রুত বয়ে চলে। লোকটা তখন রাস্তা বয়ে অনেকখানি দূরে চলে গেছে। অগ্‌নেভ পা চালিয়ে চলতে থাকে, ধরতে হবে লোকটাকে। বুকটা কাঁপতে থাকে,

সত্যি কি দুঃসাহস! লোকটা আমাদেরি হবে! অগ্নেভ লোকটাকে ছাড়িয়ে চলে যায়। তার পরে দাঁড়িয়ে পড়ে পকেট হাতড়িয়ে একটা সিগারেট বার করে। লোকটা তখন এসে পড়েছে। অগ্নেভ বলে ওঠে, "ক্ষমা করবেন। এক মিনিট। আপনার দেশলাইটা যদি দয়া করে"—অগনেভ লোকটার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। লোকটা একটু হেসে দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালাবার চেষ্টা করে। মৃদুস্বরে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "সারগো।"

সারগো চোখ টিপে চুপ করতে বলে। কাঠি জ্বালিয়ে বলে ওঠে "ঠিক আছে।" অগনেভ সিগারেট ধরায়। মুখটায় চাপা হাসি খেলে গেল। পাশে চায়ের দোকানটা খালি দেখে অগনেভের সাথে সাথেই সারগো ঢুকে পরিচিত বন্ধুর মত দু'জনে পাশাপাশি বসে পড়ল। অগ্নেভ বললো "ব্যাপার কি? লেনিনের চিঠি এসেছে। ষ্ট্যালিনের কোন খোঁজ না পেয়ে"—সারগো হেসে বললো, "জানিয়ে দিও ভালই আছে। আর যখন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য তখন আট ঘাট বেঁধেই কাজ করতে নেমেছে।"

১৯১২—এপ্রিল মাসের শেষ। সাইবেরিয়ার বন্দী শিবির। পুলিস এসে নোতুন এক জনকে ঢুকিয়ে দিল। বন্দীর দলে সাড়া পড়ে।

"স্বাগতম্ নবাগত কমরেড।"

"নবাগত মোটেই নই। একেবারে পুরানো।" গলার স্বরে সবাই চিনতে পারে।

"আরে, ষ্ট্যালিন যে।"

অন্য আর একজন হেসে বলে ওঠে, "দুর্ ষ্ট্যালিন কোথায়? ও যে চিজকভ্।"

বন্দীরা হেসে ষ্ট্যালিনকে অভিনন্দন জানায়।

"কিন্তু বন্ধু, এবার ক'দিনের জন্য?"

নির্বিকার উত্তর আসে, "ঠিক নেই। বোধহয় খুব বেশি দিন নয়।"

"দুনিয়ার হালচাল কি? প্রাণ বেরিয়ে গেল যে।"

"হালচাল আর কি? খবর শুনতে পাওনি?"

সবাই বলে ওঠে, "কি খবর? না।"

"আরে, সাইবেরিয়ার বুকের উপর বসে সাইবেরিয়ার খবর জানো না? বরফ গলতে শুরু করেছে!"

অবাক হয়ে অনেকে প্রশ্ন করে, "তা ভাই এটা কি এমন খবর। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এটা যে এপ্রিল মাসের শেষ 'ফুল' করবার কাল চলে গেছে।"

ষ্ট্যালিন হেসে বলে, "না, 'ফুল' আর করতে হবে কি! 'ফুল' তো হয়েই আছ দেখছি। লেনা, বলি লেনা সোনার খনির নাম শোননি? সেখানে গুলি চলেছে। নিশ্চলতা এবার ভেঙে গিয়েছে। জন সমুদ্র ফুলতে শুরু করেছে। বরফ গলছে। জারের সমস্ত অন্যায় আর অত্যাচার, আজকের সমাজের যত পাপ সব যেন এক সঙ্গে ওই লেনা খনির ভেতর আস্তানা পেয়েছে। গোটা রাশিয়ার নজর পড়েছে ওই লেনার ওপর। মস্কো, পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা প্রতিবাদ

জানিয়ে হরতাল করছে। প্রস্তাব পাশ করে বলেছে—এই ঘটনায় আমরা মর্মাহত! কিন্তু চোখের জল আর প্রতিবাদে খুব কাজ হবে না, একমাত্র সংঘবদ্ধ সংগ্রামই পথ দেখাতে পারে। তাই বন্ধু, লেনাই আবার নতুন দিনকে ডাক দিয়েছে।

“আরে, তোমাদের আসল ঘটনাটাই বললাম না। আমরা নোতুন কাগজ বার করে ফেলেছি—‘প্রাভ্দা।”

—“তা হলে এবার আর সত্যি কথা না বলে ছাড়ছো না বলো ?” একজন বন্দী একটু ঠাট্টার সঙ্গে বলে ওঠে।

ষ্ট্যালিনও হেসে জবাব দেয়, “হ্যাঁ, এতদিন মিথ্যা বলে এই অবস্থা, এবার সত্যি বললে অবস্থা কি হবে বলা যাচ্ছে না। তবে এ কথা ঠিক যে এই প্রাভদাই আগামী বিপ্লবের বীজ পুঁতছে। আজকে মাত্র তার প্রথম সংখ্যা বেরুবে আর আজকেই ধরলো। দেখতেও পেলুম না চেহারাটা কেমন।”

সেপ্টেম্বর ১৯১২। প্রাভদার অফিসে জোর কাজ চলছে। সম্পাদকের ঘরের নীল আলো রাস্তার বুক ছুঁয়েছে। তর্ক চলেছে, কোন দিকে কারো খেয়াল নেই। কালো ওভারকোটা চাপিয়ে একটা লোক এসে সোজা সম্পাদকের টেবিলের সামনে দাঁড়াল। সবার নজর গিয়ে পড়ল সে দিকে। সম্পাদক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো,—কেউ কোন শব্দ করলো না। ঘরে যে একজন অভাবনীয় লোক এসে

হাজির হয়েছে এমন প্রকাশই নেই, তবু আবহাওয়া একেবারে পালটে গিয়েছে।

"কখন এসেছো ষ্ট্যালিন!"

"এই মাত্র। সোজা অফিসে। নির্বাসনের পালা শেষ হয় নি। তবে আর থাকতে পারলুম না। নির্বাচন এসে গিয়েছে। এখন কি আর বসে থাকা যায়।"

"কিন্তু তোমার এখান থেকে এখন চলে যেতে হবে।"

"কোথায়? কোন ব্যবস্থা করেছো!"

"তা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন সোজা সেখানে না গিয়ে চল আমরা একটা মিটিং থেকে ঘুরে আসি। তোমায় বলতে হবে।" সম্পাদকের সঙ্গে ষ্ট্যালিন বাইরে চলে এলো।

* * *

পোড়ো বাড়িটার ভিতরে মানুষের গলার আওয়াজ। চারিদিক জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। কোনদিকে সাড়শব্দ নেই। পিটার্সবার্গ শহরের বাইরে গ্রাম শুরু হলো এখান থেকে। বাড়িটাই যেন তার সীমা রেখা টেনে দিয়েছে। মানুষ এখানে বড় একটা আসে না। তবু আজ এখানে এক গোপনীয় সভা বসেছে। সামান্য কয়েকজন—সবাই ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য। কাল সভা বসবে, কি করতে হবে এই নিয়ে আলোচনা। ষ্ট্যালিন বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন—"আমরা চাই পরিষদের কক্ষে আপনাদের আওয়াজ ফেটে পড়ুক। সর্বহারার মূল দাবী, ১৯০৫ সালের দাবী আপনারা সেখানে

গিয়ে পেশ করুন। ঐক্যবদ্ধ ভাবে ওই দাবীর ভিত্তিতে এগিয়ে যান।

"জনসাধারনের জীবনের সাথে ঐকান্তিক যোগের ফলে আপনাদের দাবী জোরদার হোক্।

"রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনারা অগ্রসর হোন্। সভ্যদের প্রতি এই আমার নির্দেশ আর সভা বসবার আগে পরিষদের সামনে শোভাযাত্রার আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা তো আগেই বলেছি।"

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "আমি এইমাত্র ক্রেকাউ থেকে আসছি। লেনিনের সাথে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ষ্ট্যালিনের এই ইস্তাহার সম্পর্কে এই তিনি লিখে পাঠিয়েছেন 'ভুলোনা, ফেরৎ দিও। ময়লা করো না। মূল্যবান কাগজ।' আর শোভাযাত্রার জন্য তিনি বলেছেন 'সময়টা বেছে নেওয়া খুব ভাল হয়েছে।"

সভায় হাততালি পড়লো।

* * *

কিছুদিন আরো কেটে গেল। ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি প্রাভ্দা পত্রিকা আজ তার পাঠক ও দরদীদের একটা জলসা ডেকেছে। এমনি তারা মাঝে মাঝে এক আধটা জলসা দেয়। লোক হয় খুব বেশি···আইনের চোখে ধুলো দিয়ে আজো যারা কাজ করে চলেছে 'তারাও এই ভিড়ের মেলায় লোকজনের সাথে মিলতে মিশতে পারে। আজ তেমনি একটা জলসা। স্ট্যালিনও এসেছে। মাঝখানের দিকে

ষ্ট্যালিন বসে এক বন্ধুর সাথে গল্প করছে। জলসা তখনও শুরু হয় নি। চারিদিকে নানা রকম কথা ভেসে বেড়াচ্ছে।

"জানো ষ্ট্যালিন, তোমার 'মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা' সত্যি সত্যি এক বিরাট সমস্যার সমাধান করলো। লেনিন গোর্কিকে কি লিখেছে জানো?...'জর্জিয়ার এক অদ্ভুত ছেলে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসেছে। সব রকম মাল-মসলাই সে যোগাড় করেছে।' লেনিন নিজে যে প্রবন্ধ লিখেছে, তাতে বলেছে যে, জাতি সমস্যা সম্বন্ধে যত লেখাই বেরিয়েছে তার ভেতর ষ্ট্যালিনের লেখা সবার আগে আসে।"

ষ্ট্যালিন সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে, "কিন্তু দেখছো ম্যালিনভস্কি আসেনি।"

—"সেই তো ইয়াকভকে ধরিয়ে দিয়েছে। এবার তার কি মতলব আছে তার ঠিক কি! তোমার আজ এখানে আসা উচিত হয়নি।" তারপরে কিছুক্ষণ থেমে বলে, "ম্যালিনভস্কি কেমন বুদ্ধিমানের মত এসে বিশ্বাসঘাতকতা করলো!"

হঠাৎ হলের ভিতর চিৎকার শুরু হয়ে গেল। পুলিস এসে হলটাকে ছেয়ে ফেলেছে। পালাবার কোন পথ নেই। চারিদিকে উত্তেজনা থম্ থম্ করছে।

ষ্ট্যালিন আবার পুলিশের হাতে।

এবার নিয়ে তার ছ'বার নির্বাসন হল।

আর্কাহানস। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। বরফের দেশে বৃষ্টি নেমেছে। দূরে অল্প আঁধার দুলছে...

বন···জঙ্গল। ও যেন এক মায়ার রাজ্য। অস্পষ্ট আলোকে স্বপ্নের মত আবছা—মধুর। ঘরের দরজা বন্ধ। ভেরা সুইজার নির্বাসনে। সামনে পড়ে রয়েছে অনির্দিষ্ট দিন গুলো এই সন্ধ্যার মত আঁধারের তলায়। পথের ইঙ্গিত আছে, তবু পথ নেই। নির্বাসন কবে শেষ হবে ভেরা অধৈর্য হয়ে পড়ে। পিছনে ফেলে এসেছে বলিষ্ঠ কাল, সংগ্রামের অগ্নি শিখায় জ্বল্ জ্বল করা দিন। তবু সে ইতিহাস! আজকের এই সন্ধ্যায় যেন ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু বিপ্লবের প্রাণ, ম্লান হয় না। ভেরা তা হতে দেবে না। শাসনের আর শোষণের অকুণ্ঠ নিপীড়নে ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে-ওঠা প্রাণ ভেরা দেখেছে, দেখেছে বাড়িতে বাড়িতে খেতে খামারে, বস্তীতে আর কারখানায়। সে যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে; সকল রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন অবিরাম সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা। ভাবতে ভাবতে ভেরা তার ডায়রীর পাতা উলটে যায়। হঠাৎ এক জায়গায় ভেরার চোখ থমকে দাঁড়ায়। সে পড়ে চলে—

"শীতকাল। সুরান স্প্যানডারানকে নিয়ে একদিন কুউরেইকার দিকে চললাম পুলিশের চোখ এড়িয়ে। ষ্ট্যালিনের সাথে দেখা করতে হবে। সে সময় পরিষদের বলসেভিক সভ্যদের নিয়ে মামলা চলছিল। তা ছাড়া পার্টিরও গোটা কয়েক কাজ ছিলো। ষ্ট্যালিনের সাথে দেখা করে সে সব গুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে সময় দিনরাত এক হয়ে গিয়েছে। বরফের আচ্ছন্নতায় ঘনিয়ে এসেছে

এক অন্তহীন রাত্রি। ইনিসির কূল বেয়ে আমাদের শ্লেজ গাড়ি ছুটলো—ছুটলো—থামছে না। অনেক দূর পার হয়ে গেলুম। পার হলুম বন, দু'পাশে বরফে ঢাকা মূর্চ্ছাতুর জঙ্গল। পিছনে চিৎকার করতে করতে ছুটলো নেকড়ে। তবু আমাদের শ্লেজ থামলো না।

"শেষে এসে পৌঁছালাম কুউরেইকায়। খোঁজ করতে শুরু করলাম কমরেড ষ্ট্যালিন কোথায় থাকেন। গ্রামটায় প্রায় গোটা পনরো ঘর আছে! হাজির হলাম সব চেয়ে খারাপ এক বাড়ির সামনে। ষ্ট্যালিন এখানে থাকেন। একটা বাইরের ঘর আর একটা রান্না ঘর, সেখানে থাকে গৃহস্বামী তার ছেলে পিলে নিয়ে। অন্য আর একখানা ঘর আছে, সেটাই কমরেড ষ্ট্যালিনের।

"ষ্ট্যালিন আমাদের দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আমাদের খুশি করার জন্য প্রায় সব কিছুই করলেন। ছুটলেন ইনিসির কূলে। বড়শিটা বরফে আটকে গিয়েছে। তবু মাছ ধরতে হবে। কিছুক্ষণ এমনি কাটলো। তার পরে, ওমা, ষ্ট্যালিন ঘাড়ে করে মাছ নিয়ে হাজির যেন এক পাকা জেলে! তারপরে আমরা মাছটাকে তাড়াতাড়ি কুটে ঝোল রান্না করলাম। অবশ্য ঐ রান্নার সময়ই আমরা পার্টির কাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেই। ঘরের অবস্থাই গেল পালটে। ষ্ট্যালিনের বুদ্ধি কাজ করতে শুরু করলো। বাইরের অবস্থা তার কাছে যেন হার মানল। টেবিল বোঝাই বই, আর কাগজগুলো রয়েছে জমা করা। ঘরের

অন্য কোনটায় রয়েছে মাছ ধরার মাল মসলা, নানা রকমের জাল। এ সবই ষ্ট্যালিনের বোনা।”

পড়তে পড়তে ভেরা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। আপন মনেই সে বলে উঠলো, “উঃ ষ্ট্যালিনের মুক্তির কত দেরি—সেই ১৯১৭।”

ভেরা আবার পাতা উল্টে যায়। ভেরা ভাবে, “আমি তবু বাইরের খবর কিছু পাই, আর ষ্ট্যালিন?” একটা পাতায় লাল পেন্‌সিলের দাগ দেওয়া। ভেরা সেটা পড়তে থাকে। “১৯১৪ সাল। আমার জীবনের এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। নির্বাসনের মেয়াদ এখনো চলছে। এমন সময় পেলুম লেনিনের আদেশ। সেটা হ’ল যুদ্ধের ওপর তাঁর থিসিস। ভাগ্য ভাল, প্রথমে সেটা আমিই পাই। এক গোপন ঠিকানা ছিল। লেনিনের সাথে চিঠি পত্র সেই ঠিকানায় চলতো। তার পরে আমি সেই থিসিস্‌টা ষ্ট্যালিনের হাতে দিলুম। আশ্চর্য, দেখলাম যে জটিল ঐতিহাসিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও নিঁখুত ভাবে লেনিনের পথটি জেনে নিয়েছেন ষ্ট্যালিন। কি গভীর বিশ্বাস, আনন্দের ভিতর দিয়ে তিনি এটা পড়লেন, যেন লেনিনই ষ্ট্যালিনের মত সমর্থন করেছেন।

“সাইবেরিয়ায় বসেও ষ্ট্যালিনের বিশ্রাম নেই। ১৯১৫ সাল। সাইবেরিয়ার প্রান্ত দেশে গিয়ে বলসেভিক পার্টি গড়তে শুরু করেছেন। ফেব্রুয়ারী মাসে খবর এল। পার্টির একটা কাগজ বেরিয়েছে নতুন। পাহারার সমস্ত কড়াকড়ি

এড়িয়ে ষ্ট্যালিন এক কপি পেলেন সেই কাগজ। পাওয়া মাত্রেই ওখানকার লোকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাঠিয়ে দিলেন।"

ভেরার ডাইরির পাতা এমনি ব্যাপারে বোঝাই হয়ে আছে। তবু ভেরা ভাবছে—"স্ট্যালিন, মুক্তি, রাশিয়া,······"

পেচকভকে বুড়ো বললে ভুল হবে। যোয়ান বয়েস, তবু মাথার চুলে পাক ধরেছে। সামনের দাঁত কটা পড়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর আধময়লা মিলিটারি পোশাকে তাকে মন্দ মানায় নি। বন্ধুর দল এসে আড্ডা বসাবার আগেই সে পথে নেমে পড়েছে। এই পথ। ছোট বেলার কত স্মৃতি জড়ানো রয়েছে এর প্রত্যেকটা ধুলো বালির মধ্যে! এই জীবন বেশ মনে পড়ে। কুড়ি বছরে পা দেবার আগেই পেচকভ ঘোড়ার পিঠে চড়ে পার হল এই গ্রাম। কসাকদের গ্রাম। বড় রাস্তা অবধি তার বাবা এসে পৌঁছে দিল তাকে। পিঠ চাপড়ে বললে "বুঝলি আমরা হলাম জাতিতে কসাক। আমরা বীরের জাত। জারের সেবার জন্য ভগবান আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। তলোয়ার হলো আমাদের বন্ধু। এ কথা কোনদিন যেন ভুলিস্ নে।" ভোলেনি, পেচকভ তা ভুলেনি। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে জোর কদমে বেরিয়ে যায় পেচকভ। ওই নদীর পাশে, সৈন্যদের ক্যাম্পে। মনে ঘুরতে থাকে একটা কথা; "আমরা বীরের জাত।" "জারের সেবা।" না, পেচকভ আজো তা ভোলেনি। প্রায় বারো বছর পার হয়ে গেছে বাবার কথা আজো

মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় "বীরের মত।" কিন্তু জারের সেবা? না, জারের সেবা আর নয়। জারের সেবা তো প্রাণ মন দিয়ে করেছে; কিন্তু পেয়েছে কি? বুড়ো বাপ মরার সময় ভগবানের নাম অবধি করতে পারেনি কেবল করেছে তারই নাম। পেচকভ বারবার ছুটি চেয়েছে কম্যানডারের পা জড়িয়ে ধরেছে। কম্যান-ডার জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়েছে—এত জোরে যে পেচকভের একটা দাঁতই পড়ে গেল। দয়া নেই, মায়া নেই! কম্যানডার! ঘৃণায় পেচকভের মুখটা কালো হয়ে ওঠে। বিড় বিড় করে আপন মনেই বলে ওঠে "না জারের সেবা নয়।"

চিন্তার স্রোতে ভেসে যায় পেচকভ। এই তো সেদিন। সেদিন কৃষ্ণ সাগরের বুকে নাবিকরা বিদ্রোহ করে উঠল। জাহাজের মাথার ওপরে ওড়ানো জারের পতাকাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে টানিয়েছিল নিজেদের মুক্তির নিশান। পেচকভ নিজে তা দেখেছে। সে দিন মনে হয়েছে এরা কি ভাবে দেশের সর্বনাশ করেছে। পেচকভের হাতের বন্দুকটা সেদিন আপনা আপনিই উঠলো ওই বিদ্রোহীদের দমনের জন্য। সেদিন সে প্রথম পেল ষ্ট্যালিনের ইস্তাহার। ষ্ট্যালিন আবেদন জানিয়েছে সৈন্যদের "ভাই তোমরা তো শ্রমিক। তোমরা শ্রমিক থাক্ না তোমাদের গায় সৈন্যের পোশাক। তাই ভাই সব শোন, আমরা যদি মুক্তি ছিনিয়ে আনতে পারি, তোমরাও তো পাবে সেই মুক্তি!" সেদিন পেচকভ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেই ইস্তাহার। জারের বিরুদ্ধে অস্ত্র। আজ পেচকভের বুকটা দুঃখে ভরে

উঠেছে। কেন, কেন সেদিন তারা এই সহজ কথাটা বুঝেনি!

তবু, তবু ক্ষতি নেই। এবার তারা বুঝতে পেরেছে। প্রাণ দিয়ে শক্তি দিয়ে তারা কিসের জন্য মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে?. যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ ! কিন্তু কেন এই যুদ্ধ, কার জন্য যুদ্ধ? জারের জন্য? কারখানায় কারখানায় মজুর হরতাল করেছে। আদেশ হয়েছে তাদের ওপর গুলি চালাও। পেচকভ তাও করেছে। পেট্রোগ্রাডের পথে আজো তার স্বাক্ষর মুছে যায় নি। অনাহারে কাঁদছে মানুষ, সামান্য মাইনেতে পেট চলে না তাই মজুরী বাড়ানো চাই। এই সব তো সামান্য দাবী। তবু তাদের উপর গুলি চালাতে হয়েছে পেচকভের। মজুর বুক পেতে দিয়েছে। মরবার সময় বলে গেছে, "আমাদের কেন মারছ? তোমরাও তো এমনি না খেয়ে মরছ।" আর বলতে পারেনি। সত্যিই তো, তারাও না খেয়ে মরছে, উৎপীড়নে জ্বলছে। তবু পেচকভ সেদিন কিছু করতে পারেনি। আবার এল যুদ্ধ।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে বোঝা পড়া হবে জার, ইংরাজ আর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর। কিন্তু জার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন মোটেই। তাই প্রতিপদে তিনি হলেন হতমান। লক্ষ লক্ষ সৈন্য দিল প্রাণ!—

একটি একটি করে কেটে গেল তিনটি বছর! ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী! অধৈর্য্য জনগণ করল বিদ্রোহ। জারের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে এল ছিনিয়ে। নেতারা হলেন

দেশের কর্তা! তাঁরাই ডাকলেন আবার ধণিকদের। নেতা আর ধণিকদের নতুন রাজত্ব হল রাশিয়ায়। কারখানার মজুর আর খেতের চাষা ভাবল তাদের দুঃখের রাত বুঝি শেষ হল! সৈনিকরা ভাবল তাদের গড়খাই এর জীবনের বুঝি এল ছেদ।

পেচকভ ছুটলো। কিন্তু আর না। সারা দেশ গিয়েছে তার বিপক্ষে। পেচকভের নেশা এবার ছুটেছে। একটা দিন বেশ মনে পড়ে পেচকভের। এইতো সেদিন। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি। আবার আগের মত এল এক আবেদন। এবার আবার প্রাভদায়। লেনিন, ষ্ট্যালিনের আবেদন। না, আর পারবে না পেচকভ। সেদিন রাত্রেই সে পালাল। পেচকভ ভাল ভাবেই বুঝেছে একমাত্র বিপ্লবের পথেই মুক্তি আসতে পারে। শ্রমিক কৃষকের সাথে মিলে রক্তাক্ত সংগ্রামেই একমাত্র মুক্তির পথ। আজ যখন রাশিয়ার ঘরে ঘরে আগুণ জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে তখন সে কি করে রাজ সেবা করতে পারে। সে বীরের জাত। তলোয়ার তার একমাত্র বন্ধু। তাই সে এবার এই কসাক পাড়ায় কাজ শুরু করবে রাজার বিরুদ্ধে, মালিকের বিপক্ষে; জমিদারের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে।

চলতে চলতে পেচকভ অনেক দূর এসে পড়েছে। সামনে রয়েছে খোলা মাঠ। এখানে জমিদারের ফসল উঠতো। আর সেখানে হবে বীর কসাকদের মিটিং। কসাক! কসাক! রুশের বিপ্লবীদের কেউ কেউ নাক সিঁটকে ছিলো। ওরা তো জারেরচর, জমিদারের চাকর। আজ

পেচকভ বুঝিয়ে দেবে কসাকরা গোলাম নয়, কসাকরাও বিপ্লবী হতে পারে।

সভা। পেচকভের গলা গর্জন করে উঠেছে। "আমি নিজে আর কি বলবো? ষ্ট্যালিন কি বলছে শোন। শোন, বোঝ। "পুরানো ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে চাই বিপ্লবী আর সৈন্যদের মধ্যে মিতালি। আজ যারা সৈন্যদের পৌশাক পরে বেড়াচ্ছে তারাও তো আসলে কৃষক আর মজুর। তাই এদের মিলন চাই। সাময়িক মিলন নয়, বিপ্লবকে সফলতার মোহনায় নিয়ে আসার জন্য চাই স্থায়িত্ব। বিপ্লব বিরোধীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে গড়ে তোল লৌহ দৃঢ় ঐক্য। একমাত্র এই পথই সফলতার সন্ধান দিতে পারে। তারি জন্য রয়েছে সোভিয়েট মজুর ও সৈন্যদের ডেপুটিরা। সমগ্র জনতাকে তাদের কাছে নিয়ে এস।"

পেচকভ পড়ে চলেছে জোর গলায়। এমন সময় একটা লোক বলে উঠলো, "কিন্তু রাশিয়ার লোকেরা অন্য প্রদেশের সবাইকে ঠাট্টা করে, তাদের মনে করে বোকা আর গাধা।"

পেচকভ বাধা দিয়ে বললো "জানি। সে কথা বর্ণে বর্ণে ঠিক। কিন্তু ভাই এই যে ভেদাভেদ আমাদের মধ্যে রয়েছে তা সৃষ্টি করেছে এই জার। আমাদের সৈন্য-দলের কথাই ধরো না। কসাকদের জন্য আলাদা বাহিনী থাকে। তবু একবার সেটাকে ভেঙে দিয়ে দলের ভেতর কিছু ইউক্রেনের আর জর্জিয়ার লোক নেয়। আমরা

তাদের সঙ্গে এক হারে মিশে গেলাম। সেনাপতি ছিলো খোদ মস্কো-এর। তখন এখানে ওখানে বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়েছে। সেনাপতি দেখেই অবাক হয়ে গেল। রেগে বলে উঠলো, 'উল্লুক কসাক, ইউক্রেনের লোকের সাথে আস দোস্তি করতে।' দিল আমাদের তাড়িয়ে ?

"আমাদের রাগ গিয়ে পড়ল ওই লোকগুলোর উপর। একদিনও ওদের সাথে আমরা কথা বলিনি। তারপরে একদিন দেখি সেই সেনাপতি মারলো ইউক্রেনের লোকটার পেটে এক লাথি।' এমনি ভাবে ওরা ভেদ সৃষ্টি করে। আসলে, ওরাও তো আমাদের মত পদে পদে মার খেয়ে মরছে। তাই আমাদের ভেতর তফাৎ কোথায় ? তবু সন্দেহ রয়েছে। তাই বলসেভিকরা বলেছে প্রত্যেক জাতির জন্য স্বাধীনতা থাকবে, তাদের নিজেদের ব্যবস্থা একমাত্র নিজেরাই করবে কেউ তার ওপর হাত দেবে না। তাদের জন্য তারাই আইন তৈরি করবে। তখন, তখন আর ভয় কোথায় ?

"কোন ভয় নেই। কাল আঠারই জুন। কাল গোটা রাশিয়া ব্যাপী যুদ্ধ-বিরোধী শোভাযাত্রা হবে। আমাদের সেই শোভাযাত্রা সংগঠন করতে হবে। ষ্ট্যালিন বলেছে, 'কালকের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকের জ্বলন্ত বিপ্লবরূপে দেখা দিক।'

"কাল, দিকে দিকে উড়ুক বিপ্লবী পতাকা। সাম্যবাদের স্বাধীন পতাকা।

"এই পরিষদের পতন হোক!"

"ধনিকবাদ ধ্বংস হোক!"

"সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা চাই!"

বিপ্লবী জনতার পদভরে কেঁপে উঠ্‌ল রাজধানীর রাজপথ। চলল গুলি! এবার আর জারের গুলি নয়। এতদিন যে সব নেতার উপর জনতার ছিল আস্থা—তাদেরই আদেশে পুলিশের গুলি এসে লাগল জনতার বুকে। নেতারা ক্ষিপ্ত! তাঁদের অনুমতি না নিয়ে বলসেভিকদের নির্দেশে কেন হলো এতবড় শোভাযাত্রা! সেনাপতি কর্নিলভও চমকে উঠলেন। কেরেনস্কীকে সরিয়ে দিয়ে রাজ্য দখলের চক্রান্ত বুঝি ভেঙে গেল বলসেভিকদের বাঁদরামির জন্য! যে সৈন্যদল নিয়ে তিনি অভিযানের চক্রান্ত করছিলেন বিপ্লবী শ্রমিকের সংস্পর্শে—আর পেচকভের মত কর্মীর দৌলতে তারা হয়ে গেছে আধা বিপ্লবী! তিনি নিজেও হলেন কেরেনস্কীর বন্দী।

নিরঙ্কুশ অত্যাচার চলল বলসেভিকদের উপর। তাদের মুখপত্র প্রাভদার অফিস দিল তারা ভেঙে! হুলিয়া বেরুল লেনিনের গ্রেপ্তারের! বলসেভিকদল হলো আধা বে-আইনী!

১৯১৭ সালের আগষ্ট মাস। বলসেভিক পার্টির কনফারেন্স বসেছে। আবহাওয়া খুবই গরম। বিপ্লবের মুখোমুখি আবার পার্টির ভিতরে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। লেনিন এখনও ফিনল্যাণ্ডে।

সভা আরম্ভ হয়েছে। ষ্ট্যালিন তাঁর রিপোর্ট পড়ছেন— "গোড়ায় আমার মনে হয় আমাদের লক্ষ্যগুলো বলে রাখা ভাল। আমরা চাই, উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করতে, কৃষকদের জমি দিয়ে দিতে, ক্ষমতা মধ্যবিত্তের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এনে দিতে কৃষক মজুরের হাতে।

"আজকে দেশের অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে। অহিংস উপায়ে ক্ষমতা লাভ করার আশা আজকে আর নেই।"

সভায় আপত্তি উঠলো। প্রেয়োব্রাজেনস্কী বলে উঠলো— "ইওরোপে বিপ্লব না হলে রাশিয়ায় বিপ্লবের সফলতা আশা করা অন্যায়।" ষ্ট্যালিন তার উত্তর দিয়ে বললেন—

"বিপ্লব এখানে হবে এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সকল রকম উপাদানই আছে। এধারণা ভুল যে; ইওরোপে বিপ্লব হলে তবেই এখানে বিপ্লব সফল হতে পারে।" ষ্ট্যালিনের কণ্ঠে যুক্তির বিদ্যুৎ।

এবার উঠলেন বুখারিন, পুরানো নেতা। তিনি বললেন—"চাষীরা যুদ্ধের পক্ষপাতী। তারা কিছুতেই আমাদের সাহায্য করবে না।"

তার উত্তর দিয়ে ষ্ট্যালিন বললেন—"ওটা আপনাদের ভুল ধারণা। অবিশ্যি বড় লোক চাষী আমাদের সাথে যোগ দেবে না, তবে গরীব চাষীরা আমাদের সাথে থাকবেই।"

নানা দিক থেকে উঠছে নানা রকম প্রস্তাব। তবু ষ্ট্যালিন প্রস্তাবকে ভোটে ফেললেন। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

মস্কৌ বিপ্লবী কমিটির অফিসে আজ নোতুন নোতুন লোকের মেলা। অভূতপূর্ব উত্তেজনায় প্রত্যেকটা স্নায়ুতন্ত্রী পর্যন্ত সাড়া দিয়ে উঠছে। বারুদের গুদামে শুধু একটা মাত্র ফুলকির অভাব। প্রস্তুতির মহড়া শেষ হয়েছে, এবার অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের প্রতীক্ষা। একজন কর্মী উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন; "কমরেডস্, মস্কৌ থেকে এইমাত্র ষ্ট্যালিনের আবেদন পত্র এসেছে। এটা বিশেষ ভাবে শ্রমিকদের জন্য প্রেরিত।" সভায় হাততালি পড়লো। কমরেডস, তিনি লিখেছেন,—'বিপ্লব মরে যায় নি। হয়ত একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা আবার নোতুন ভাবে জেগে উঠছে। এবারই হবে শত্রুর সাথে শেষ সংগ্রাম।'

'আরো বুলেট ছুটবে।

'বিজয় আরো গভীর হবে আমাদের।

'আগত সংগ্রামকে সংগঠিত করার এইতো মহড়া।

'আমার মজুর বন্ধু! রুশ বিপ্লবের গৌরবজনক ভূমিকা নিতে হবে আপনাদের। জনসাধারণকে সংগঠিত করে পার্টির তলায় তাদের আনুন। সেই জুন মাসকে কি আপনাদের মনে পড়ে? শত্রুর গুলি চলেছিল যখন আপনাদের বুকে। সেদিন একমাত্র যে পার্টি আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো— সে হলো আমাদের পার্টি। তাই এ পার্টি আপনারও পার্টি। আপনার স্থান এরই পতাকার তলায়। কৃষক বন্ধু! আপনাদের নেতারা আপনাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা আপনাদের টেনে নিয়ে গিয়েছেন ধ্বংসের মুখে। শ্রমিকরাই আপনার একমাত্র বন্ধু। একমাত্র এদের সাথে হাত মেলালে আপনাদের মুক্তি আসতে পারে।

'সৈনিক বন্ধু! বিপ্লবের শক্তি নির্ভর করছে জনসাধারণের সাথে আপনার মৈত্রীতে। মন্ত্রীর পর মন্ত্রী আসবেন কিন্তু সাধারণ মানুষ, তারা তো চিরকাল থাকবে। তাই আপনারা সেই সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। তাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দিন।"

সভা হাততালিতে ফেটে পড়ছে। বক্তার গলা ভেসে আসছে—"এ আবেদন নিয়ে চলে যান জনসাধারণের মধ্যে। ষ্ট্যালিন বলেছেন, ষ্ট্যালিন আমাদের অভিবাদন জানিয়েছেন, 'মস্কোতে হরতাল! মস্কো দীর্ঘজীবী হোক।' সে দীর্ঘজীবী

হতে পারে যদি আজ আমরা জনসাধারণকে আন্দোলনে টেনে আনতে পারি। আর আমরা তা আনবোই। আমরা,স্ট্যালিনের ধন্যবাদের যোগ্য হব।"

৭ই নভেম্বর : ক্রেমলিন

ঘড়ির পেনডুলামের মত এতদিন শহর যেন দুলছিল, হঠাৎ থেমে গেল কেন? কেনই বা আজ মিছিলে মিছিলে এত অস্ত্রের রূপ সজ্জা। বাবু পাড়ার ঘুম ছিল না এ' কদিন ধরেই। আজকে তাঁদের একেবারে তন্দ্রার রেশটুকু পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে। বেলকনি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁরা দেখেন সৈন্য আর রেড গার্ড এক সাথে ছুটে চলেছে। তবে, তবে কি সত্যি সত্যি বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল নাকি? পাড়ায় পাড়ায় সোর গোল ওঠে। "সরকার বিপন্ন।" এগারোটা, এখন এগারোটা। অফিসের মুখেই বাবু মানুষ থমকে যান—। রূপ পালটে গিয়েছে যে! এ যেন এক নোতুন অফিস। এখানে যেন নোতুন লোক। কোথায় গেল জারের আমলের সেই গর্বোদ্ধত মানুষগুলো? কোথায়? আজতো তাদের পতাকা অফিসের মাথায় হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে না? ওখানে যে আর এক পতাকা! এতদিন পথে পথে যারা ঘুরে বেড়িয়েছে সহানুভূতির আশায়, নোংরা লোকগুলোর হাতে ছিল যে পতাকা, সেই লাল পতাকা আজ অফিসের ধপ্‌ধপে বাড়িটার উপর উড়ছে পতপত করে। এও বিশ্বাস করতে হবে?

স্ট্যালিনের প্রচার পত্র। নোতুন, এও নোতুন। বাবুরা তবু পড়েন। শুকনো গলা কাঠ হয়ে গেছে তবু তারা পড়েন।

গাড়িতে ঘোষণাপত্র। ইস্তাহার আর পোস্টারে শহরের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম।

*　　　　*　　　　*

৯ই নভেম্বর। আজ লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম শ্রমিক কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতি সমস্যার জন্য কমিশার হয়েছেন ষ্ট্যালিন।

সোভিয়েটের অধিবেশন বসেছে। একটার সময় বসবার কথা কিন্তু সভাপতি মণ্ডলীর দেখা নেই। স্মোলনী ইনষ্টিটিউটে হাজার হাজার লোকের ভিড়। ব্যগ্র ব্যস্ত জনতা জানতে চায় তাদের ভবিষ্যৎ। বলসেভিকদের বিরোধিতা করছে আগের অকর্মণ্য নেতারা। অবশেষে মিটমাট হলো। বলসেভিকরাই হলো বিজয়ী। ৮টা ১৩ মিনিটে লেনিন এলেন—মহান লেনিন! অপেক্ষমান জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। সাধারণ চেহারা—অতি সাধারণ হাল চাল! ইনিই কোটি কোটি মানবের নয়নের মণি!

বিখ্যাত বিপ্লবী ঘোষণা পড়লেন তিনি। শেষ করলেন এই বলে ঃ নভেম্বর বিপ্লবের পর সমাজ বিপ্লবের পথ মুক্ত হয়ে গেছে আমাদের। শান্তি ও সমাজতন্ত্রবাদের জন্য বিজয়ী মজুর আন্দোলনের অগ্রগতি আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

জারের অত্যাচারিত পরাধীন প্রদেশগুলিকে ষ্ট্যালিন শোনালেন মুক্তির বাণী! একই ভাষায় যারা কথা বলে, একই সভ্যতা আর সংস্কৃতি যাদের তাদের নিয়ে নোতুন নোতুন প্রদেশ গড়া হবে। তারা সবাই থাকবে স্বাধীন। ইচ্ছে হলে

রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তারা থাকতে পারে, ইচ্ছে না হলে থাকবে না! কেউ তার জন্য জোর করবে না। এটাই স্ট্যালিনের অবদান—জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। দূর দূরান্তরের পরাধীন চাষীরা এতদিনে ফেললো মুক্তির নিশ্বাস।

* * *

১৯১৮ সাল। সবে মাত্র বিপ্লব সফল হয়েছে। শোষণের উপর যে সমাজ ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল, বার বার আঘাত খাচ্ছিল মরণাপন্ন মানুষের হাতে, তা আজকে একেবারে ধ্বংস হয়েছে—গড়ে উঠেছে নোতুন সমাজ। পৃথিবীর অন্য যে সব দেশে এখনও ধনিকদের শোষণ ব্যবস্থা অটুট রয়েছে তাদের চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ালো আজ এক নোতুন রাষ্ট্র। তার হাতে অত্যাচারের মৃত্যুর পরোয়ানা।

বলশেভিক রাষ্ট্রের সাফল্যে সাম্রাজ্যবাদীরা চমকালো। অত্যাচারীর উদ্যত কৃপাণ উঠল কেঁপে। তারপর প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটলে পরস্পর শত্রুতা ভুলে চৌদ্দটি রাষ্ট্র আক্রমণ করল এই নবজাতককে! পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে চারিদিকে শত্রু!

মারিয়া আজ বড় হয়েছে। এখন আর মায়ের গলা ধরে অভিমান জানায় না। সে আজকাল দেশের ডাকে এগিয়ে আসে সবার আগে। নবজাত সোভিয়েটকে রক্ষা করার জন্য মারিয়ার বিন্দু মাত্র বিশ্রাম নেই। বলসেভিক কমিটির সভ্য মারিয়া। অফিসে বসে আছে। মনে এক রাশ চিন্তা নেমে এসেছে। "বাকু, বাকু, আমার বাকু।

যেখানে শ্রমিক জানালো প্রথম প্রতিবাদ সমস্ত শাসনের বিরুদ্ধে, যেখানে ঝলকে উঠলো প্রথম প্রতিরোধের খড়গ! জারতন্ত্রের অত্যাচারে এখানকার কারখানাই প্রথমে জানাল ইনকিলাবের অভিনন্দন—আর আজ তারা, আজ তারা ইংরেজ ধনিকের কাছে মাথা হেঁট করবে। তারা এমনি ভাবে ছেড়ে দেবে তাদের নবলব্ধ মুক্তি! ধ্বংস হবে? লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও নয়।” মারিয়া ভেবে চলেছে। এক বন্ধু এলো। মারিয়া চোখ তুলে তাকালো। মৃদুস্বরে বললো, “কি খবর।” বন্ধুটি কোন রকমে যেন উত্তর দিল—“ডনের কসাকরাও বিদ্রোহ করেছে।” মারিয়া যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। এ যেন মারিয়াকে কোন আঘাতই দেয় নি। অল্প হেসে মারিয়া বললো—“অন্য খবর কি?”

“ডনে জার্মানরা আক্রমণ করেছে। কি সাংঘাতিক, ডন হাত ছাড়া হলে তো না খেয়ে প্রাণ যাবে। লড়াই করবো কি নিয়ে? সময় বুঝে মেনসেভিকরাও বাগড়া দেবার চেষ্টা করছে। শুনলাম সেনাদলের মধ্যেও গোলোযোগ দেখা দিয়েছে। আর হবে না, সেনাপতিরা তো আগের লোকই বেশি। তলে তলে তারাই—“বন্ধুটি যেন আরো কি বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আর একজন এসে হাজির। কোন দিকে না চেয়ে সোজা মারিয়াকে লক্ষ্য করে সে বললো—“শুনেছো প্রেম আক্রমণ করেছে ওরা। আমাদের দল ক্রমশঃ পিছু হটে আসছে।”

লোকটার মুখের দিকে সোজা চেয়ে মারিয়া উত্তর দেয়, “তা হলে তুমি বলতে চাও যে আর লড়াই করে কাজ নেই। আমরা সবাই এবার আত্মসমর্পণ করি।”

"মারিয়া তুমি ভুল বুঝছ কেন? এত অল্পে তোমার মাথা বিগড়ে গেল?"

"কাকে কি বলছো খেয়াল নেই?" লোকটার গলায় স্পষ্ট ভৎর্সনা।

মারিয়া চমকে যায়, বলে, "ক্ষমা করো, অন্যায় করে ফেলেছি।"

লোকটা হেসে ফেলে বলে, "সেটা বড় কথা না মারিয়া। এই মাত্র খবর পেলুম লেনিন তার করেছেন যে, সৈন্যদের ভেতর নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে বলে ষ্ট্যালিনকে পাঠান হবে সেখানে।"

"ষ্ট্যালিনকে পাঠান হবে?" মারিয়ার মুখের ওপর দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। মারিয়া আপন মনে বলে উঠলো, "রাশিয়ার শ্রমিকদের সাথে আর লেনিনের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে, শ্রমিক আর বড় লোকের এই বিবাদের ভেতর এসে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করলুম শ্রমিকের পার্টির নেতা হতে গেলে কি হতে হয়। এখানে আমি এই তৃতীয় বার বিপ্লববাদে দীক্ষিত হলুম। রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে আমি বিপ্লববাদ নিঃশেষ করে শিখে ফেলতে পেরেছি।"

—"ভুল হলো মারিয়া তুমি পারনি। ও পেরেছে ষ্ট্যালিন।"

হেসে মারিয়া উত্তর দেয়, "আমার কথা বলছিলুম না। আমি বলছিলুম তাঁরি কথা। আমার বিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে। রক্ত দিয়ে শ্রমিক তার স্বাধীনতা কিনেছে, রক্ত দিয়ে সে তাকে রক্ষাও করবে।"

২৩শে মে। ক্রেমলিনের অফিসে লেনিন পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। উত্তেজিত হলে তিনি এমনি ভাবে বেড়াতেন। জারিৎসিন—জারিৎসিন থেকে ভাল খবরই আশা করা যায়। জার্মানদের সাথে মিলে কসাকরা বিদ্রোহ করেছে। ষ্ট্যালিনের তার—কি তার? লেনিন টেবিলের কাছে এসে তারটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন—"আমি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি কাউকে ক্ষমা করবো না—এমন কি নিজেকেও না। যাই ঘটুক না কেন, গম আপনাকে পাঠাবই। আর আমাদের সেনাপতিরা যদি একটু সজাগ থাকতেন তা হলে শত্রু কিছুতেই এত এগিয়ে আসতে পারতো না।" টেলিগ্রাফটা পড়ে হঠাৎ আবার চেয়ারে বসে পড়ে লেনিন লিখতে শুরু করলেন।

টেলিফোন বেজে উঠলো। সেক্রেটারী টেলিফোন ধরলো।

"হ্যালো, কে?"—

অপর দিক থেকে ভেসে আসে উত্তর—"ষ্ট্যালিন। ভ্লাদিমিরকে চাই।"

সেক্রেটারী লেনিনের দিকে ফিরে বলেন, "ষ্ট্যালিন—আপনার সাথে।"

"ষ্ট্যালিন?" লেনিনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। টেলিফোন ধরলেন লেনিন নিজে। ষ্ট্যালিনের গলার গম্ভীর আওয়াজ কানে এসে বাজছে। "ককেসাসের উত্তরে অনেক গম আছে। কিন্তু রেলপথ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কোন

কিছুই পাঠান সম্ভব নয়। সামারা সারাটোভের দিকে এক দলকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে মনে হচ্ছে এক হপ্তার আগে কিছু করা সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় দিন দশেকের ভেতর লাইন একেবারে ঠিক করে নিতে পারবো। গমের জন্য কিছু কাল ধৈর্য ধরুন। গমের বদলে মাছ মাংস দিন সবাইকে। সেগুলো আপনাকে আমরা এখনও কিছু পাঠাতে পারি।"

লেনিন বললেন, "পারো? তাই পাঠাও। এখানকার অবস্থ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। না খেয়ে লোক কত দিন থাকতে পারবে।"

—"চেষ্টা করছি। তবে এক হপ্তার ভেতর আমরা আরো ভালো অবস্থায় এসে হাজির হবো।"

লাইন কেটে গেছে। লেনিন আপন মনে বলে চলেছেন—গম নেই, মাছ মাংস…। বেলা বেড়ে যায়। যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে লোক তাই নিয়েই চলে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথা ওড়ে—"এমনি ভাবে ক'দিন চালাবো।"

বুড়ীরা গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে, "ও বাবা চুলোয় যাক সোভিয়েট। না খেয়ে প্রাণ গেল।" অমনি তাকে চেপে ধরে দোকানের ছেলে মেয়েরা। তাকে বোঝাতে শুরু করে কেন এমন হচ্ছে। এর জন্য দায়ী কে বা কারা?

পথ থেকে কথার রেশগুলো লেনিনের কানে গিয়েও হাজির হয়। তবু ভরসা আছে।

"একটা টেলিগ্রাম।"

"কই দেখি?" লেনিন খাম ছিঁড়ে পড়তে লাগলেন, "১৬০ গাড়ি গম ও ৪৬ গাড়ি মাছ পাঠাচ্ছি। পরে সারাটভের পথ দিয়ে অন্য সব পাঠাচ্ছি।" ছোট্ট টেলিগ্রাম। লেনিনের মুখে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

সেক্রেটারী বলে উঠলো, "যাক্, এবার তবু অবস্থাটা ফিরলো।" তারপরে হেসে বলে উঠলো, "ষ্ট্যালিন বলতো না ঠাট্টা করে, সৈন্য দলের আস্তাবল সাফ করার কাজে আমি এক বিশেষজ্ঞ। তাই সত্যি।"

১১ই জুলাই। ইউক্রেনের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। লেনিন আবার তার পেলেন। "উত্তর-ককেসিয়ার সেনাপতিরা বিপ্লব বিরোধীদের দমন করতে একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। অবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। তাঁরা সৈন্যদের যুদ্ধে চালনা করছেন না বরং দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছেন। মনে হচ্ছে এ যুদ্ধে যেন তাদের কোন কিছুই করবার নেই। কালিনিনের সৈন্য রসদ পাচ্ছে না। সমস্ত উত্তর-রাশিয়ার সঙ্গে গম খেতগুলোর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে এসব দুর্বলতা এবং ত্রুটি আমি সংশোধন করার চেষ্টা করছি। যদি দরকার বুঝি তা হলে সেনাপতিদের এখান থেকে সরাতে বাধ্য হব। এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ হয়তো বা বাতিল করতে হতে পারে। মোট কথা উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি।"

বিপ্লবী সামরিক কমিটির মিটিং বসেছে। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেনাদলের পুনর্গঠন। নানা রকমের সমস্যা ও মতামত

এসে হাজির হচ্ছে। ষ্ট্যালিনের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা!

কেগানভিচ তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেনঃ "জার্মান সেনা ভল্গার ধার থেকে আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলেছে। সে দিনকার কথা আমার মনে জ্বল জ্বল করছে। ডনেৎসের শ্রমিকরা ওদিকে গড়ে তুলেছে এক কম্যুনিষ্ট সেবা দল। লাল পল্টন তাকে চালনা করে অদ্ভুত ভাবে জার্মানদের বিছিন্ন করে ফেলে। এই ভয়ানক সময়ের মধ্যেও ষ্ট্যালিন রয়েছেন ধীর, স্থির, অচঞ্চল। তিনি একবার এগিয়ে যাচ্ছেন গুলির মুখোমুখি আর একবার আসছেন সৈন্যদের মাঝখানে। নিজে তাদের দেখাশোনা করছেন, বোঝাচ্ছেন। কিন্তু শত্রু পক্ষে কখন হয়েছে নোতুন সৈন্যের আমদানী। আমরা হয়ে পড়েছি শ্রান্ত। আক্রমণ প্রতিহত করে রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। ওরা ভল্গার মুখ থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো, পাশ কাটানো আর সম্ভব নয়। তবু ষ্ট্যালিন কিন্তু তখনও পালানোর কথা চিন্তা করছেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য—বিজয়। সেই জয়ের বাণী দিয়ে তিনি সেনাদলকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তার পরে সেই দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন জয়ের গৌরবও অর্জন করলেন। ওরা তখন ডনের ধার দিয়ে পালাতে শুরু করেছে।"

এতক্ষণে বিপ্লবী সামরিক কমিটি সিদ্ধান্তে এসে হাজির হয়েছে। বিজয়ের আগের কথা হলো সেনাদলের পূনর্গঠন।

সেটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা তো আগে করতে হবে। তাই সমর কমিটি ষ্ট্যালিনের কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠাবে ঠিক করলো। "শৃঙ্খলা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এস। সেনাদলকে কেন্দ্রীভূত কর, সৈন্যেরা যারা পালাতে শুরু করেছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এস। উপযুক্ত সেনাপতি নিয়োগ কর এবং সকল রকম অন্যায়ের দমন কর। লেনিনের সম্মতি আছে।"

সমর কমিটি এই তার পাঠাবে ঠিক করলো।

১৯১৮ সালের শেষের দিক। লেনিন রিপোর্ট পড়ছেন। "সারা রুশিয়া থেকে আমরা পশ্চাদপসরণ করছি। তিন নম্বর বাহিনী একে বারে ভেঙে গিয়েছে। খাবার নেই, পরবার কিছুই নেই, সাহায্য করবার মত কোন লোক নেই। নীতির দিক দিয়ে সেনাবাহিনীও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ট্রটস্কিপন্থীরা বরাবর বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে। প্রায় আঠারো হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে। কামান বন্দুক ইত্যাদি সব তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে।

রিপোর্টের পাতায় পাতায় হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে দীর্ঘ ছ'মাসের যুদ্ধের ব্যর্থতার ইতিহাস। কালো কালো রেখা গুলো যেন রক্তরাঙা পটভূমিকার নিদারুণ ছবি। এমন ভাবে চললে তো নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে! সে রণাঙ্গনে সেনাপতি ট্রটস্কি।

লেনিন খস্ খস্ করে লিখে চলেছেন।

বেল বাজলো—সেক্রেটারী এসে দাঁড়ালো।

"এই টেলিগ্রামটা এখুনি পাঠিয়ে দিতে হবে।" লেনিন আবার টেলিগ্রামটা পড়লেন, জোরে জোরে যেন সেক্রেটারীকে

শোনাবার জন্য। "প্রেম থেকে পার্টির রিপোর্ট পেয়েছি। সৈন্যদের মধ্যে নানা রকমের নৈতিক দুর্বলতা লক্ষ্য করছি। চিন্তা করছি ষ্ট্যালিনকে পাঠাবো—এটা সমর কমিটিকে পাঠাতে হবে। আর একটা আছে এটা ট্রটস্কিকে—ষ্ট্যালিনকে না পাঠিয়ে উপায় নেই।"

১৯১৯। বিপদ আরো নোতুন করে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। অবস্থা বিবেচনার জন্য সমর কমিটির সভা বসেছে। বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়ে জেনারেল ডেনিকিন দক্ষিণ রাশিয়া আক্রমণ করেছে। কলকারখানা প্রায় সব ধ্বংস হয়ে গেছে। জিনিস পত্রের অভাব এখনো রয়েছে চারিদিকে। —অন্যদিকে এসেছে প্রেম থেকে ষ্ট্যালিনের রিপোর্ট।

"—আচ্ছা পড়ুন তো ষ্ট্যালিনের রিপোর্ট।"

—"শুনুন: এখন প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে এগারো হাজার অবসন্ন হয়ে পড়েছে। শত্রুর সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এদের আর নেই। ট্রটস্কি যে সেনাদল পাঠিয়েছে তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ওরা আদেশ অমান্য করছে এবং করবেও। উট ভাইট্কা বিপন্ন। তাকে রক্ষা করতে গেলে নতুন সৈন্য পাঠানো প্রয়োজন—অথবা ওখানে আবার প্রেমের পুনরাভিনয় হবে।"

—"তা হলে ষ্ট্যালিন ওখানে আর কিছুদিন থাকলে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠিক করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে।"

কমিটির প্রধানতম সদস্য বলে উঠলেন, "আমার মনে হয় প্রেম থেকে এখন ষ্ট্যালিনকে সরিয়ে আনা যায়। রিপোর্টে

বেশ বোঝা যাচ্ছে সে প্রেমকে আবার সবল করে দিয়েছে। রিজার্ভ কিছু পাঠালেই চলবে। কিন্তু এখুনি যদি ডেনিকিনকে প্রতিরোধ না করা যায় তবে অবস্থা আবার ঘুরে যাবে।”

কমিটি তাই ঠিক করলো। ষ্ট্যালিন এলেন কমিটির সামনে। কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

ষ্ট্যালিন বললেন—“আমার কোন আপত্তি নেই। ডেনিকিনের সামনে আমিই যাবো। কিন্তু তার আগে আমার তিনটে শর্ত আছে। আমি তা কমিটির কাছে বলছি। আশা করি সে সব শর্তগুলো রাখা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

“আমার প্রথম কথা—দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ট্রটস্কির কোন হাত থাকবে না।

“দ্বিতীয় হলো ট্রটস্কি যে সব সেনাপতি নিয়োগ করেছে আমি তা প্রয়োজন হলে সরিয়ে দেবো—এবং নিজের মনোমত সেনাপতি নিয়োগ করব। তৃতীয় কথা হলো আমি যে সব নেতা এবং সেনাপতিদের যুদ্ধে পাঠাতে বলবো তাদের সেখানে পাঠাতে হবে। কেমন আপনারা রাজী আছেন?” একজন সদস্য হেসে বললেন—“এ আর নোতুন কি। কমরেড লেনিন তো আপনার টেলিগ্রাফের উত্তরেই এ অধিকার দিয়েছেন।”

“—হ্যাঁঃ, তা হলে আপনারা রাজী?”

কমিটি সম্মত হলো।

কালিনিন লিখে চলেছেন:

“—গৃহ যুদ্ধের সময় কমরেড স্ট্যালিনের সামরিক কাজ যেন নিজেই একটা মহাকাব্য। তবু মাত্র যুদ্ধ জয়েই এর

শেষ নয়, এর গুরুত্ব হচ্ছে বুদ্ধি এবং বিচারে। সবার উপরে রইল তার সংগঠনের ক্ষমতা। এই দিয়েই তো শক্তিশালী শত্রুদের বিনাশ সম্ভব হলো।"

কমরেড লেনিন যে ষ্ট্যালিনের উপর কত গুরু কাজের দায়িত্ব আরোপ করতেন তা শুধুমাত্র একটা টেলিগ্রাম থেকেই বোঝা যাবে। এটা তিনি পাঠিয়েছিলেন তুর্কিস্থানের প্রতিরোধ-কারী বিপ্লবী বীর ভাইদের। "এখুনি বেছে নাও শক্তিশালী লোকদের। তাদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি কর। তারপর ষ্ট্যালিনের আদেশ মত কাজ কর।"

ভরোশিলভ লিখে চলেছেন ঃ

"১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কমরেড ষ্ট্যালিনই বোধহয় একমাত্র লোক যাকে কেন্দ্রীয় কমিটি এ সীমান্ত থেকে ও সীমান্ত পর্যন্ত পাঠিয়ে ছিলেন—পাঠিয়ে ছিলেন সেই সব জায়গায় যেখানে প্রতিক্রিয়া মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে, যেখানে বিপদ হয়ে উঠেছে ঘনীভূত।"

চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। প্রেম আত্মসমর্পণ করেছে। এমন সময় কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্ট্যালিনের সাথে আর একজনকে দিয়ে পাঠালেন পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে।

যেখানে অবস্থা ভাল ভাবেই চলেছে সেখানে ষ্ট্যালিনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেখানে লাল ফৌজ হেরে যাচ্ছে, প্রতিবিপ্লবীরা জিতছে, যেখানে সমগ্র সোভিয়েট শক্তির অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে সেখানেই দেখা যাবে কমরেড ষ্ট্যালিনকে। বিনিদ্র

রজনী আর অক্লান্ত পরিশ্রমে ষ্ট্যালিন শক্ত হাতে ধরে রইলেন নেতৃত্বের হাল। সকল রকমের প্রতিবন্ধককে চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন—আর রইলো অমোঘ বিশ্বাস, একদিন ঘটনার গতি ফিরে যাবে সুদিন আবার আসবে।

১৯২০ সাল। গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে।—ধ্বংসস্তূপও যেন কথা বলছে। আবার নোতুন করে গড়ে তুলতে হবে এই দেশ—পৃথিবীর সর্বপ্রথম সাম্যবাদী দেশ। মস্কো থেকে ফিরে এসে অবধি পপনেজের মনের ভিতর একটা কথাই বারবার ঘুরে আসছে। এই নুয়ে-পড়া রাশিয়াকে গড়ে তুলতে হবে মানুষের সমবেত প্রচেস্টায়। পপনেজও মস্কো যাবার আগে এই কথাই ভেবে গিয়েছে। এখানে থেকে কিছুটা করবার চেষ্টাও করেছে। তবু সে বারবার বাধা পেয়েছে ওই কুলাকদের কাছ থেকে। কুলাকরা তো জোতদার, হ্যাঁ, জোতদার বলতে হবে বৈকি! পপনেজ অনেক বার চেষ্টা করেছে তার গ্রামকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে কিন্তু তার প্রত্যেকটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুধু মাত্র কুলাকরা এসে নষ্ট করে দেয়নি, ওদের সাথে যোগ দিয়েছে এখানকার মেনসেভিকরা। লোকের মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এখন তো আর তারা সামনা সামনি আসতে পারে না, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেশের ক্ষতি করে—পপনেজ ভাবতে ভাবতেই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গ্রামের পথ দিয়ে পপনেজ চলেছে। হঠাৎ তার সাথে দেখা হয়ে গেল তারি এক বন্ধুর।

—"আরে পপনেজ যে? কি মস্কো থেকে?"

"হ্যাঁ ভাই, এখানকার সব খবর ভাল ?"

"তা এক রকম কেটে যাচ্ছে। তবে কি জানো লোকের মনে এবার ক্রমে ক্রমে"—বাধা দিয়ে পপনেজ বলে ওঠে, "ওটা একেবারে আমাদের দোষের জন্য। আমরা তো আজ কাল বাবু হয়ে গেছি। লোকের কাছে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা তো আমরা করিনি। এবারকার মিটিংএ এ বিষয়ে খুব আলোচনা হয়ে গেছে।" আলের বুকের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করে, "আর কি আলোচনা হয়েছে দেশকে গড়ে তোলার জন্য ? কোন কাজটাতে প্রথম হাত দেওয়া হবে ?"

"বিশেষ কিছু করা গেল না।" পপনেজের গলা বেদনায় ভরে আসে। "তবে লেনিনের একটা প্ল্যান ছিল বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পর্কে।"

"সেটা আবার কি ?" বন্ধুটি অবাক হয়ে যায়।

"ওটা হলো যে আমাদের প্রথমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত রাশিয়ায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। তারি জন্য একটা কমিশন বসানো হয়েছে তার নাম GOELRO—যাতে দশ বছরের ভেতর সমস্ত ব্যবস্থাটা একেবারে পাকা করে ফেলতে পারে। খেতে পাচ্ছিনে, পরতে পাচ্ছিনে এইতো অবস্থা। এরি ভেতর বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের কথা আমাদেরই প্রথমে আজগুবি লেগেছিলো। কিন্তু বিদ্যুৎ না হলে শিল্প গড়ে উঠবে কি করে, আর কলকারখানা যদি গড়ে না ওঠে তা হলে তো কোনদিন

খাওয়া পরার ব্যবস্থা হতে পারে না। এ ছাড়া অন্য বিষয়ও আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে? ট্রটস্কি হঠাৎ ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে মেতে উঠলো।” হঠাৎ যেন পপনেজ আগুন হয়ে উঠলো। খুব জোর তালে পা ফেলে জোরে জোরেই চিৎকার শুরু করে দিল, এখনও যেন সে মস্কো এর মিটিংএ।

বন্ধুটি তার জামার হাতটা টেনে ধরে বলে, “আরে একটু আস্তে আস্তেই বল না।” পপনেজ আবার শুরু করলো,—“ট্রটস্কি বলে যে যুদ্ধের সময় যে ব্যবস্থা চালু ছিল এখনও সেই ব্যবস্থাই চলুক। আসল উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমাদের সাথে সাধারণ লোকের সম্পর্কটা আরো দূর হয়ে যাক। এই অবস্থাতেই তো অনেক লোকের মনে বেশ সন্দেহ রয়েছে। আর যুদ্ধের ব্যবস্থা যদি আমরা চালিয়ে নিয়ে যাই তা হলে আর কেরেনেস্কী আর আমাদের মধ্যে তফাৎটা থাকবে কোথায়? লেনিন ষ্ট্যালিন এক সঙ্গে এই নীতির উপর তীব্র আক্রমণ চালালো। যাক্ ট্রটস্কির প্রস্তাবটা হেরে গেছে।” পপনেজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

—“কাল এর উপর আমাদের মিটিং হচ্ছে।”

—“হ্যাঁ, কাল।”

দ্রুত পা চালিয়ে অন্ধকারের ভেতর পপনেজ অদৃশ্য হয়ে যায়।

* * *

১৯২১ সাল। ডিসেম্বর মাস। আজ বলসেভিক পার্টির দশম অধিবেশন। গোটা রাশিয়া থেকে প্রতিনিধিরা

এসেছেন, আর এসেছেন কত দর্শক। এ অধিবেশনের দাম অনেক এ কথা সবাই বুঝেছেন। কিন্তু এবার তার চেয়েও আর একটা আকর্ষণ আছে—ষ্ট্যালিনকে দেখার। ষ্ট্যালিনকে কে না দেখেছে তবু ষ্ট্যালিন এবার অসুখ থেকে উঠেছেন। সবার কত আগ্রহ! অনেক লোক গল্পই শুরু করে দিয়েছেন ষ্ট্যালিন গোপনে কেমন ভাবে কাজ করতেন, তাঁদের সাথে কাজ করতে করতে ষ্ট্যালিন কি বলেছিলেন, সবাই তাদের নিজের জীবনের ব্যক্তিগত কাহিনী বলে চলেছেন।

—"আর অসুখ হবে না? পোড়া রুটি আর এক টুকরো মাংস খেয়ে কতদিন চলে?"

—"তার উপরে এই যুদ্ধের সময়, কটা রাত ঘুমিয়েছিল? হাতে গোনা যায়। আমি তো জানি।"

—"কিসের অসুখ? পেটের যন্ত্রনা, না?"

—"হ্যাঁ। লেনিন তো ভেবেই একশেষ। তিনি তো সারগোকে এক টেলিগ্রাম করলেন, 'ষ্ট্যালিনের অবস্থা কি রকম? ডাক্তররা কি বলছেন এখুনি জানাও।' শুধু তাই নয়, সে ডাক্তারের নাম ঠিকানা কি?"

"তারপরে তো লেনিন নিজেই তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। ঘুম হয় না। রান্না ঘরের পাশেই ছিল তার ঘর, খুব গোলমাল।"

হঠাৎ মণ্ডপে জয়ধ্বনি উঠল লেনিন আর ষ্ট্যালিনের। তারপর সবাই চুপচাপ—সভামণ্ডপ ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

ষ্ট্যালিন তাঁর রিপোর্ট পড়তে শুরু করলেন। জারের অধীনে পিছিয়ে পড়া জাতিসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি রিপোর্ট করছেন। রাশিয়া বহুজাতির দেশ। রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল, দক্ষিণ রাশিয়ার মুসলমান প্রধান দেশের লোক জারের অধীনে পশুরও অধম জীবন যাপন করতো। এইসব নানা জাতির লোককে মিলিয়ে এক করে গড়ে উঠবে নোতুন রাশিয়া। তার নাম হবে 'সংঘ সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র'—ইংরাজীতে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকস্। বিভিন্ন দেশের বহু জাতির লোক স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলবে। ইচ্ছে করলে সে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের বেরিয়ে যাবারও স্বাধীনতা থাকবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে এভাবে সব জাতির সমান অধিকার স্বীকার করবার সাহস নেই কারুর। বলসেভিকরা সত্যিকার বিপ্লব চান বলেই সবজাতির সমান অধিকার স্বীকার করতে পেরেছিলেন।

* * *

১৯২২ সাল। এপ্রিল মাস। আবার বসেছে বলসেভিক পার্টির সভা—কেন্দ্রীয় সভা। আজ প্রথমে লেনিন একটা প্রস্তাব তুলবেন। সভ্যদের ভিতর বেশ চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে।

লেনিনের প্রস্তাব বজ্রাঘাতের মত সভায় এলো। সভ্যদের একটা অংশ বেশ চমকে গেল—আমি প্রস্তাব করি "ষ্ট্যালিনকে বলসেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক করা হক!" সাধারণ সম্পাদক? এটা তো একেবারে নোতুন পদ।

কিন্তু ষ্ট্যালিনের পক্ষে কটা কাজ করা সম্ভব? ষ্ট্যালিন "জাতি সমস্যার" কমিশার, কৃষকদের অবস্থা দেখবার জন্য সরকারী বিভাগের ভারও তার উপর। তার ওপরে আবার এই নোতুন কাজ?

প্রিয়োব্রাজেনস্কি তীব্র প্রতিবাদ তুললো। তিনি একজন ট্রটস্কিপন্থী। লেনিন এবার উঠলেন জবাব দিতে।—"প্রিয়োব্রাজেনস্কি তীব্র আপত্তি তুলেছেন যে, ষ্ট্যালিন দুটো বিভাগের কমিশার। কিন্তু তুর্কীস্থান, আর ককেসাসে যে সব সমস্যাগুলো আছে তারজন্য ওই জাতির একজন কমিশারকে আমরা রাখতে বাধ্য হয়েছি। তা ছাড়া এ সবই তো রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য সব সমস্যাও আছে —তাদের তো সমাধান করা চাই। সে সব সমস্যা গোটা ইওরোপের বুকে যুগ যুগ ধরে চেপে বসে আছে আর তার খুব সামান্য পরিমাণই আমরা সমাধান করতে পেরেছি। আমরা এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি, আর তার জন্য আমাদের একজন উপযুক্ত লোকও চাই। সে লোক অন্ততঃ এমন হওয়া উচিত যার কাছে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা আসবেন এবং আলোচনা করবেন। এমন লোক আমরা কোথায় পাব? আমার বিশ্বাস এমন কি প্রিয়োব্রাজেনস্কিও ষ্ট্যালিন ছাড়া অন্য কারুর নাম করতে পারবেন না।

"শ্রমিক কৃষকদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য যে কমিশারকে আমাদের রাখতে হয়েছে তার মূল কারণ হলো ওই

একই। কাজটা খুবই কঠিন। কিন্তু এই পরিদর্শনের কাজ চালানোর জন্য তেমনি এক জন শক্তিশালী লোক আমাদের চাই—তা না হলে আমরা খুব ছোট খাট ঝগড়া মারামারি নিয়ে দিন কাটিয়ে দেব।"

তবু প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হ'ল, লেনিন জিতে গেলেন। এবার থেকে ষ্ট্যালিন হলেন রাশিয়ার বলসেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

* * *

২১শে জানুয়ারী ১৯২৪।

চলতে চলতে ইতিহাস একবার থমকে দাঁড়াল। "লেনিন মারা গেছেন—।" বরফে ডুবে গেছে সারা দেশ। গাছগুলো যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো এই খবর। পথের দু'ধারে মানুষের সার এক হাঁটু বরফে। কারো মুখে কোন কথা নেই, নিশ্বাস পর্যন্ত যেন বন্ধ হয়ে গেছে—"আবার... আবার ভ্লাদিমির, একবার চোখ খুলে চাইবে না—?"

সোভিয়েটের কাউন্সিল। দৃঢ় চেতা কালিনিনেরও ঠোঁঠ কাঁপছে। মাত্র কটা কথা মুখথেকে বাইরে এলো "আজ লেনিন মারা গেছেন।" কালিনিনের গলা বন্ধ হয়ে এলো। লৌহ মানুষ ষ্ট্যালিনের চোখে জল কেন? তিনি যেন মনে মনে বলে চলেছেন,···পার্টি কখনো সংখ্যার দিকে তাকাবে না।···লেনিন কখনো সংখ্যার বন্দী ছিলেন না।···আমাদের পার্টির ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে সংখ্যার সাথে মতবাদের দ্বন্দ্ব হয়েছে, শ্রমিকের স্বার্থের সাথে দ্বন্দ্ব বেধেছে। এমন সময়

লেনিন কোন চিন্তা না করেই তাঁর মতবাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পার্টির বেশির ভাগ লোক হয়তো তার বিপক্ষে চলে গিয়েছে।···তিনি জোর দিয়ে বলতেন, "মতবাদের নীতি হলো সব চেয়ে বড় নীতি।"

খুব বুদ্ধিমান আর পড়ুয়ারা—যারা বিপ্লবের অ, আ থেকে অনুস্বার চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত জেনে ফেলেছে, তারা সাধারণতঃ একটা রোগে ভোগে। সে রোগ হল জনসাধারণকে ভয় করা, তাদের সৃষ্টিশক্তির উপর আস্থা হারানো। লেনিন ছিলেন এই সব লোক থেকে একেবারে আলাদা।···আমার বেশ মনে পড়ে একজন কমরেডের সঙ্গে লেনিনের আলাপ! কমরেডটি বললেন, 'বিপ্লবের পর কিন্তু সাধারণ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।' তার উত্তরে লেনিন বিদ্রূপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'এটা বড়ই দুঃখের কথা যে, যে সব ভদ্রলোক বিপ্লবী বলে পরিচয় দেন তাঁরা ভুলে যান যে ইতিহাসের একমাত্র স্বাভাবিক অবস্থা হল বিপ্লবের অবস্থা।' যে সব ভদ্রলোক পুঁথি পড়া বিদ্যে নিয়ে উপর থেকে জনসাধারণের দিকে তাকাতেন লেনিন তাদের বিশ্বাস করতেন না, লেনিন সব সময়ই বলতেন যে, জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

বিপ্লবের ভেতর থেকেই লেনিনের জন্ম হয়েছিলো। বিপ্লবী সংগ্রামের জলন্ত প্রতীক ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন বিপ্লববাদের গুরু। একমাত্র বিপ্লবের ভেতর তিনি খুঁজে পেতেন পরম পরিতৃপ্তি।···তাই পার্টির মধ্যে একটা কথা

রটে গিয়েছিলো—সে কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। বিপ্লবের মধ্যে ইলিচ যেন সাঁতার কাটতে পারেন। যেন জলের মাছ।...

২৬শে। লেনিনের মৃত্যুতিথি পালন করা হবে। মানুষ-গুলো যেন বোকা হয়ে গেছে। সবার বুকের ভেতর ফুলে ফুলে উঠছে একটা মাত্র প্রার্থনা—করুণ প্রার্থনা,

"রুশ দেশের কমরেড লেনিন!
পাথরের কবরে শয়ান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।
আইভান আমি চেনা চাষী
মাটি মাখা দু' পা আমার
লড়েছি তোমার সাথে সাথে
কাজ সারা হয়েছে এবার।
রুশ দেশের কমরেড লেনিন!
পাথরের কবরে অম্লান
পাশ দাও, কমরেড লেনিন!
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

*

চ্যাং আমি লোহা শাল থেকে
শাংহায়ের পথে ধর্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি, মরি, ডরি না সঙ্কটে

রুশ দেশের কমরেড লেনিন !
জাগ্রত সে পাথরে শয়ান
জনযোদ্ধারা হুঁশিয়ার
দুনিয়াই আমাদের স্থান ।*

সারি সারি মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ভেসে আসছে ষ্ট্যালিনের আবেগ রুদ্ধ স্বর—"আমরা, কম্যুনিষ্টরা আলাদা ছাঁচের মানুষ। আমরা একেবারে আলাদা ধাতু দিয়ে গড়া। আমরা হলাম তারাই, যারা সর্বহারার বিরাট বাহিনী গড়েছে— লেনিনের বাহিনী। সেই বাহিনীতে যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন বড় সম্মান নেই। যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা কমরেড লেনিন সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে জগতে আর কোন বড় সম্মান নেই।...

"আমাদের কাছ থেকে বিদায় কালে কমরেড লেনিন আমাদের,আদেশ দিয়ে গেছেন সেই পার্টি সভ্য হওয়ার বিরাট গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। কমরেড লেনিন ! আমরা প্রতিজ্ঞা করছি সে আদেশ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করবো।

"বিদায় নিয়ে কমরেড লেনিন আমাদের আদেশ দিয়েছেন চোখের মণির মত পার্টির ঐক্য রক্ষা করতে...। কমরেড লেনিন, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি আপনার সে আদেশও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করবো।

"বিদায় নেবার সময় কমরেড লেনিন আমাদের অনুরোধ করে গেছেন শ্রমিকের একনায়কত্বকে পালন করতে। তোমার

* ল্যাংষ্টন হিউজ—অনুবাদ বিষ্ণু দে

কাছে প্রতিজ্ঞা করছি কমরেড লেনিন, সে অনুরোধও আমরা যোগ্যতার সঙ্গে রক্ষা করবো।

"বিদায় নেবার সময় কমরেড লেনিন আমাদের অনুরোধ করে গেছেন কৃষক মজুরের সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে। তোমার নামে শপথ করছি কমরেড সে অনুরোধও আমরা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করবো।

"অনেকবার লেনিন এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে লাল-ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করা ও উন্নত করা আমাদের পার্টির সব চেয়ে বড় কাজ। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি কমরেড লেনিন, আমরা লালফৌজ ও লাল নৌবহরকে দৃঢ় করার জন্য সব কিছুই করবো।

"বিদায় নেবার সময় কমরেড লেনিম আমাদের আদেশ দিয়েছেন কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে। আমরা আবার তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি কমরেড লেনিন, তুনিয়ার শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিককে শক্তিশালী করতে আমরা প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হব না।"

* * *

লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রটস্কিবাদীরা আবার অভিযোগ আনলেন, পার্টি নেতৃত্বে আমলাতন্ত্র মনোভাব এসেছে। ষ্ট্যালিন উঠলেন তার জবাব দিতে।

—"বিপদ ওটা নয়। বিপদ হলো পার্টির জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত হবার বিপদ। আপনার পার্টি থাকতে পারে পুরোপুরি ভাবে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর, কিন্তু সেই পার্টির সাথে যদি জনসাধারণের কোন যোগ না থাকে তা হলে সে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়বে, মূল্যহীন হবে। পার্টি থাকে তার শ্রেণীর জন্য। যদি পার্টি তার শ্রেণীর সাথে এক হয়ে যেতে পারে, জন-সাধারণের কাছ থেকে যদি সে পায় সম্মান তা হলে পার্টি বড় হয়ে উঠতে পারে—হাজার আমলাতন্ত্রী মনোভাব তাতে থাকুক না কেন। কিন্তু সে যদি সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে তা হলে আপনি যতই পার্টির গণতান্ত্রিক বা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সংস্কার করুন না কেন সে পার্টি ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। বলসেভিক পার্টি হলো

মজুর শ্রেণীর একটা অংশ—তার অস্তিত্ব একমাত্র তার সেই শ্রেণীর জন্য। পার্টি শুধু পার্টির জন্য নয়।

"পার্টিতে বয়সের সমস্যা মোটেই জটিল নয়। পার্টির ইতিহাস দেখলে আমরা দেখতে পাবো যে নোতুন পার্টি সভ্যরা সভ্য পদের উপযুক্ত লোকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। অথচ দেখা গিয়েছে যে তরুণ সম্প্রদায় থেকে পার্টি সভ্য বশি করে হয়। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে সভ্য হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরা একেবারে আলাদা—যেন কুলীন—যদি তাঁরা নোতুন লোককে দলে টানতে না পারেন, যদি তাঁরা মনে করেন যে যারা পার্টি সভ্য নয় তারা নিচু স্তরের লোক, তারাই পার্টি সভ্য এবং সভ্য হওয়ার মত লোকদের ভেতর একটা বিভেদ আনে আর গণতন্ত্রের প্রশ্নকে তারা নিয়ে আসে বয়সের প্রশ্নে। গণতন্ত্রের মূলনীতি আর বয়সের মুলনীতি দুটো আলাদা জিনিস। গণতন্ত্রের মুলনীতি হল কত স্বাধীন এবং সক্রিয় ভাবে সভ্যরা পার্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে পারে। একমাত্র তখনই গণতন্ত্রের কথা উঠতে পারে। তা যদি না হয় তবে আমরা শুধু মুখেই গণতন্ত্রের কথা বলবো।"

* * *

১৯২৬ সাল। মেনসেভিক আর ট্রটস্কিপন্থী এক হয়ে গেছে। গোটা রাশিয়াময় তারা এক বিরাট অভিযান শুরু করেছে— একটা মাত্র দেশে কি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? লোক আশার আলো দেখতে পেয়েছে, সমাজতন্ত্রবাদের দিকে চলেছে জোর কদমে। হঠাৎ এই ব্যাপার। লোক যেন একটু চমকে

গেল। বিদ্যুতের আলো শুধু মাত্র মরে যাওয়া কল কারখানার বুকে আবার প্রাণ সঞ্চার করলো না, রাশিয়ার অগণিত সাধারণ মানুষের বুকে আবার বুলিয়ে দিলো জীবনের নবতম স্পন্দন। মরচে পড়া ইঞ্জিন যেন আবার কালো কালো কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার রাশ্ আকাশের বুকে ছুঁড়ে মেরে চলতে শুরু করলো। এই সময় এলো পুরানো শত্রু নোতুন রূপ নিয়ে। কাজ না 'করে' শুধু বড় বড় প্রশ্ন এনে মাথা বিগড়ে দিতে লাগল তারা। কিন্তু মানুষ আজ চলতে শুরু করেছে—পায়ে পায়ে কোথায় ধুলো হয়ে উড়ে যাবে ওই তুচ্ছ বিষয়গুলো। স্ট্যালিন দিয়েছেন পথের নির্ভুল নির্দেশ।

ষ্ট্যালিন উত্তর দিয়েছেন— "পৃথিবীতে এখন দুটো জিনিস দানা বেঁধে উঠছে। এক প্রান্তে ধনতন্ত্র চেষ্টা করছে আবার নিজের প্রতিপত্তি ফিরিয়ে এনে শোষণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে। আর অন্য প্রান্তে রয়েছে সোভিয়েট ব্যবস্থা, যেখানে জনসাধারণ মুক্তির মুখ দেখেছে। এখন প্রশ্ন—কে জিতবে? দুনিয়া জোড়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব নয়। পৃথিবী আজ এই দুটো ভাগে একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ধনতান্ত্রিক জগতের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইংরেজ আর আমেরিকার ধনিকরা, অন্যদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক জগত যার নেতা হচ্ছে সোভিয়েট। আন্তর্জাতিক অবস্থা পালটে যাবে কিনা তা এই দুটো শক্তির তারতম্যের উপরনির্ভর ক'রে।"

ট্রট্স্কীর মতে সারা পৃথিবীময় না হলে একমাত্র রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু ষ্ট্যালিন তারও উত্তর দিয়েছেন।

"এখন একটা প্রশ্ন সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে— আমরা কোন পথে এগিয়ে যাবো ? একটা দেশে কি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব ?

"একটা দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মানে কি ? তার মানে হলো দেশের ভেতর জনগণের যে সুপ্ত শক্তি আছে তার সাহায্য নিয়ে শ্রমিক এবং কৃষকদের ভেতর যে সব বিভেদ রয়েছে তা মিটিয়ে ফেলে দেশের শ্রমিকের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং সে ক্ষমতাকে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কাজে লাগানো, অবশ্যই তার পিছনে থাকবে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকের সহানুভূতি···

"আজকে যদি সোভিয়েট সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে যায় তা হলে কি ফল হবে ? ফল হবে যে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের অবস্থা ফিরে যাবে, তারা ধনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে—পৃথিবী-জোড়া সাম্যবাদের পথ পরিষ্কার করবে।"

আজ সারগোর খুব কাজ পড়ে গেছে। সমস্ত রাশিয়াকে শিল্পে উন্নত করতে হবে। আজ তার মনে ভেসে আসছে লেনিনের কথা। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের প্রত্যেকটি পয়সা যেন বড় বড় শিল্প গড়ে তোলার জন্য ব্যয়িত হয়। আমাদের বিদ্যুতের ব্যবস্থা পাকা করতে হবে, জল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের ভবিষ্যৎ।" কিন্তু এতদিন তারা পেরে উঠেনি।

পেরে উঠেনি, অভাব, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, নিজেদের দেশের ভেতর বিবাদ, এমনি শত সহস্র তুচ্ছ কারণে। তবু ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে সব বিপদই তো তারা কাটিয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়, এই তো ১৯২৭ সালে পোলাণ্ডে রাশিয়ার দূতকে খুন করে ফেলল বৃটিশরা। উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া হয়ত এর শোধ তুলবে আক্রমণ করে, আর ওই ফাঁকে ওরা এসে কিশোর সোভিয়েট রাষ্ট্রকে দেবে শেষ করে। রাশিয়া সে ফাঁদে পা দিল না।

আজকে মিটিং হবে। দেশের শিল্পের বিষয়ে তাদের হবে আলোচনা। এক এক করে লোক জমতে শুরু করে। তার পরে সভার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। সারগো বলে চলে, "ষ্ট্যালিন বলে দিয়েছেন আমাদের উদ্দেশ্য কি হবে। আমরা শিল্প চাই, কিন্তু এখুনি আমরা সব রকমের শিল্প চাইনে। আমাদের শিল্পোন্নতির মূল ধারা হলো এই, আমরা প্রথমে গড়ে তুলবো প্রয়োজনীয় বড় বড় মৌলিক শিল্পের কল কারখানা—যেমন ধরো কয়লা, লোহা এমনি ধরনের। তার পরে গড়ে তুলবো যন্ত্রপাতি তৈরি করবার শিল্প।" দেশে যদি মৌলিক শিল্পের কারখানা থাকে তাহলে আর রাশিয়াকে অন্য দেশের ভরসায় বসে থাকতে হবে না কোনও কারণে। এতদিন রাশিয়াতে অনেক কিছুই তৈরি হত না—বিদেশ থেকে আসত মোটর গাড়ী আরও কত কি!

"কিন্তু এই যে কাজ, তা হবে কি করে? শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং সহানুভূতি ভিন্ন এই শিল্প কি গড়ে উঠতে পারে? না—তা কখনই পারে না।...তাই এ কাজকে

পুরোপুরিভাবে করতে গেলে আমাদের সাধারণ শ্রমিককে টেনে আনতে হবে। এ কাজ এত বিরাট আর এত শ্রমসাধ্য যে নোতুন লোককে টেনে না আনতে পারলে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই আমাদের কর্তব্য হলো শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি সকল স্তরের নোতুন নোতুন লোক এনে এ পরিকল্পনাকে সফল করা।”

সারগো কাজের কথায় নেমে আসে।

* * *

১৯২৭ সাল। সোভিয়েট বলসেভিক পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশন। লোক ফেটে পড়ছে। আকাশের বুকে লাল পতাকা পত্ পত্ করে নাচছে। হাততালিতে ঘর কেঁপে উঠছে। ষ্ট্যালিন তার রিপোর্ট পড়ে চলেছেন—

“আমরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে উন্নত করতে পেরেছি। উন্নতির গতি আমাদের খুব দ্রুত—এত দ্রুত যে তা ভাবনারও অতীত। এরি জন্য আমরা জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছি।

“সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষিকাজের ভেতর আমরা একটা মিল এনে দিতে পেরেছি।

“আমরা নিম্নরিক্ত কৃষকদের উপর ভর দিয়ে শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের ভেতর একটা বন্ধুত্ব এনে দিয়েছি।

“বাইরে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের চারদিকে ঘিরে রয়েছে তবু আমরা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমরা বাইরের

জগতকে দেখিয়েছি যে, শ্রমিক শুধু মাত্র ধনতন্ত্রকে ধ্বংসই করতে পারে না, সমাজতন্ত্রও গড়তে পারে।

"মোটামুটি এই হলো আমাদের অগ্রগতি।

"কিন্তু আমাদের চাষবাস অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারল না যে। তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের খেত খামার একজোটে নয়, সব ছোট ছোট, ছাড়া ছাড়া। সরকার কৃষিকাজকে এখনও জাতীয় শিল্পে পরিণত করে নি। কৃষি-ব্যবস্থা এখনো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তার পরিচালনাও সুপরিকল্পিত নয়। তাই কুলাকরা এখনো শোষণের সুবিধা পেয়ে গেছে। কৃষিকাজ পুরোপুরিভাবে জাতীয় সম্পত্তি না হওয়ার জন্য, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতন উন্নতি করতে পারছে না।...

"তাহলে এথেকে মুক্তির পথ কোথায়? পথ হচ্ছে, এই সব ছোট, ছোট বিচ্ছিন্ন খেতগুলোকে একত্রিত করে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে এনে ধীরে ধীরে এক করতে হবে, গায়ের জোরে নয়, চাষীদের সম্মতি নিয়ে—এমনিভাবে গড়ে তুলতে হবে এক সমবায় কৃষি ব্যবস্থা। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আমরা যদি এ না করতে পারি তাহলে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের চেয়ে আমরা কৃষিকাজে এগিয়ে যেতে তো পারবোই না এমনকি একসঙ্গে পর্যন্ত যেতে পারবো না।"

১৯২৯ সাল। ইউক্রেনের আকাশ ছোঁয়া মাঠের বুকে ফসলের অবাধ রাজত্ব। পাড়ার ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে খাটছে, হাসছে, গান গাইছে—এমন হাসি জীবনে

আজ তারা প্রথম হাসলো। আকাশে এমন সূর্য আজ তারা প্রথম দেখলো—রোদ্দুর এত মিষ্টি, বাতাসে এত গান ছিল!

এমন সময় ইগোর ছুটতে ছুটতে এলো। ইগোর বয়সে কাঁচা মোটেই নয়, মাথার চুলে পাক ধরেছে। ইগোরকে দেখতে পেয়ে মেয়েরা ট্রাকটর ফেলে ছুটে এলো, ছেলেরা এলো গান গাইতে গাইতে। ইগোরকে কাঁধে তুলে তারা গান গাইতে শুরু করে দিল। "ওরে তোরা কাজ করবি নে—?" ইগোর ছদ্ম গাম্ভীর্যের সাথে বলে ওঠে। ছেলে মেয়েরা আরও জোরে হেসে ওঠে। দূরে দাঁড়িয়েছিল একটা মেয়ে। এবার এগিয়ে এসে নাচের ভঙ্গিতে একটা আঙুল মুখের উপর রেখে চোখ দুটো নাচিয়ে বলে উঠলো—"উঃ, আমলাতন্ত্র? নেকড়ের মত ছিঁড়ে ফেলবো—আমলাতন্ত্র—জানো না—আমি সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট ইউনিয়নের এক জন বাসিন্দা—।" তার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে।

"বুড়ো, বুঝি তার সব কিছুই কালেকটিভ ফার্মে' দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে?"

"নারে বাবা না—।" হাত নেড়ে ইগোর বলে ওঠে। চাঙ্গা হয়েছি আর এক কারণে—। তোরা একটুখানি শোন। তোরাও হবি। ষ্ট্যালিন বলছে কি জানিস? পঞ্চায়েতী প্রথায় কৃষিকাজের পথে কৃষক তো এতদিন নামে নি। এ পরিবর্তন হঠাৎ হতে পারে না। ঠিক কথা,—পঞ্চায়েতী কৃষিকাজের কথা পার্টি বলেছিল ১৯২৭ সালে। কিন্তু শ্লোগান তোলা আর কৃষককে সমাজতন্ত্রের পথে ঠেলে দেওয়া তো আর

এক কথা নয়। শ্লোগানের উপযোগিতা ও নায্যতা আগে চাষীদের বুঝিয়ে দিতে হবে ভাল করে। তার পরে তো তারা এটাকে গ্রহণ করবে। তাই কৃষি ব্যবস্থার এই পরিবর্তন হয়েছে ক্রমে ক্রমে।"

মন্ত্র মুগ্ধের মত শান্ত হয়ে পড়ে প্রাণ চঞ্চল ছেলে মেয়ে। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ইগোর পড়ে,—"নেতা হওয়া এত সহজ নয়। নেতা কখনো আন্দোলনের পিছনে পড়ে থাকবে না। তা হলে সে সাধারণ লোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু তাকে আবার খুব তাড়াতাড়ি ছুটলে চলবে না। তা হলে আবার সে জনসাধারণ থেকে আলাদা হয়ে পড়বে। যিনি সত্যিকারের নেতা হতে চান এবং জনসাধারণের সাথে যোগ রাখতে চান তাকে দু'ধারেই নজর রাখতে হবে যেন পিছিয়ে না পড়েন, আবার যেন খুব এগিয়েও না যান।"

১৯৩৩ সাল। পৃথিবীর বুকের ওপর অর্থ নৈতিক সংকট ঘনিয়ে আসছে—সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে নেমে এসেছে মৃত্যুর কালো ছায়া, জার্মানীতে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে মাথা তুলেছে ফ্যাসিবাদ। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। তবু রাশিয়ার বুকে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ষ্ট্যালিন তার বিবরণী পেশ করছেন। "কমরেড, প্রথমে যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন খুব কম লোকই এর অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা

অনেকেই মনে করেছিলেন যে এটা রাশিয়ার নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আছে অসামান্য গুরুত্ব। ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সোভিয়েটের ঘরোয়া ব্যাপার নয়—দুনিয়ার সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ আছে এতে। অনেকদিন চলে গেছে। প্রত্যেক বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য যে সব নীতি গ্রহণ করেছে তার প্রত্যেকটি হচ্ছে কমরেড লেনিনের বাণীর সত্যতার প্রমাণ।

"বড়লোক আর তাদের খবরের কাগজ এই পরিকল্পনাকে একটু ঠাট্টা করেছিলো। বলেছিলো, এ পাগলামি, স্বপ্ন। এমনিভাবে তারা আমাদের পরিকল্পনাকে নষ্ট করতে এগিয়ে এসেছিলো। তারপরে যখন তারা দেখতে পেল যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল ফলতে শুরু করেছে তখন তারা ভয় পেয়ে গেল, বলতে লাগলো যে এই পরিকল্পনা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপর্যস্ত করছে। চিৎকার করে বললো যে এর ফলে সারা ইওরোপের বাজার ছেয়ে যাবে মালে, দরের ওঠা নামা চলতে থাকবে, বেকার সমস্যা বাড়বে।···

"সেই সময়ের পর থেকে বড় লোকদের ভেতর আবার দু'রকম মতবাদ দেখা গেল। কেউ কেউ বললো যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একেবারে বিফল হয়ে গেছে। বলসেভিকরা এখন আসন্ন ধ্বংসের মুখে। অন্যেরা বললো,—ঠিক, বলসেভিকরা খারাপ লোক সন্দেহ নেই। তবু তাদের পাঁচ বছরের পরিকল্পনা

কাজ করে চলেছে। আর খুব সম্ভব তারা আবার তাদের লক্ষ্যে গিয়ে হাজির হবে।

"সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর চক্ষুশূল। তাদের নিজেদের দেশেই জনসাধারণ খেতে না পেয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে। এই সব দেশের মজুরদের বিপ্লবের প্রেরণা জুগিয়েছে সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ধনিকরা তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বিফল করতে চায়। পরিকল্পনা বিফল হলে তারা বলতে পারবে যে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে বিপ্লব কখনই সফল হতে পারে না। আর সর্বহারা শ্রেণী এই পরিকল্পনাকে সফল দেখতে চায় কারণ এর ভেতর রয়েছে তার বিপ্লবের বীজমন্ত্র।

"পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতা পৃথিবীর শ্রমিকের বিপ্লবী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে—এ কথার কোন ভুল নেই।

"শিল্পের ক্ষেত্রে চার বছরের ভেতর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণ করে কি লাভ হয়েছে? রাশিয়ার লোহা শিল্প ছিল না! অথচ দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রয়েছে লৌহ শিল্প। এখন সেই শিল্প গড়ে উঠেছে।

"দেশে ট্রাকটর ছিল না। এখন রাশিয়ার ট্রাকটর শিল্প আছে। এমনিই হয়েছে আর সব ক্ষেত্রেও।"

ষ্ট্যালিন বলে চলেছেন। সভার এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত হর্ষধ্বনি ফেটে পড়ছে। প্রতিনিধি দল উঠে দাঁড়িয়ে ষ্ট্যালিনকে অভিনন্দন জানালো।

১৯৩৫ সাল। রাশিয়ার উন্নতি হয়েছে সব দিক দিয়ে। ডনবাস অঞ্চলে সোরগোল পড়ে গেছে। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় আলেক্সির ছবি হাসছে। বন্ধুর দল ঘিরে ফেলেছে আলেক্সিকে। সহকর্মীরা প্রশ্ন করেছে, "আচ্ছা আলেক্সি তুমি একাজ করলে কি করে ?"

সোভিয়েটের স্থানীয় অফিসে বেশ বড় রকমের সভা হচ্ছে। সবার মুখে আজ আলেক্সির কথা। খত মিলিয়ে দেখছে প্রেসিডেন্ট।—"মাত্র ছ' ঘণ্টায় ১০৬ টন কয়লা তোলা—একি সহজ কথা ?"

—"পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ একাজ করতে পারেনি।"

—"না, আলেক্সি স্টেখানোভ বেশ করেছে। আলেক্সিকে নমস্কার করছি হাজারবার। কিন্তু তাই বলে তো আর এ কথা ঠিক নয় যে আলেক্সিকে আমরা হারিয়ে দিতে পারবো না।" একটা যুবক বলে ওঠে। "বেশ তো খুব ভাল

কথা, কর না। খুব ভাল হবে।” আনন্দে আত্মহারা হয়ে আলেক্সি তাকে জড়িয়ে ধরে।

বুড়ো সোমানভ কোন রকমে শান্তি পাচ্ছে না। সোমানভ এ এলাকার একজন নাম করা লোক—কয়লার ব্যাপারে তার যে জানাশোনা ভাল রকমই এ কথা দশ পাঁচ জনের বিশ্বাস ছিল। হঠাৎ আলেক্সি এলো—আলেক্সিকে কাজ শিখিয়েছে সোমানভ হাতে কলমে। শুধু আলেক্সি নয়—সোমানভ ভাবছে।

“এই যে নিকিতা—কোথায় চলেছ?” বুড়ো বেশ হেসে বলে ওঠে। পর মূহূর্তে আবার গরম হয়ে ওঠে, “না শুধু মাত্র নিকিতা তো নও—তোমরা সবাই স্টেখানোভ।” নিকিতা ভ্রূ দুটোকে নাচিয়ে বলে ওঠে “তা বুঝি তোমার রাগ হয়েছে? কিন্তু জান ওরা আমায় হারিয়ে দিয়েছে। আমি তো তুলে ছিলাম ২৪০ টন, আত্‌কিন আবার তুলেছে ৩১০ টন। আমি হেরে গেছি কাকা।” নিকিতার গলাটা ভার হয়ে আসে।

আশ্চর্য হয়ে সোমানভ বলে, “তা এর জন্য তোমার এত দুঃখ কেন?” সোমানভ যেন সত্যই জানতে চায়।

“তুমি কি বলছো কাকা। আমাদের কয়লার যে খুব দরকার।”

“তোমাদের দরকার? তোমার তো নয়?”

নিকিতা অবাক হয়ে গেল। একবার যেন চোখ দুটো জ্বলেই নিভে গেল! ম্লান হেসে সে বললো, “আমরা আজ কাল গোটা দেশটাকে দেখি—দেশ কেন পৃথিবীকে।” “ও” বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে। তার পরে বলে, “আচ্ছা তোদের একটা মিটিং হয়েছিল না—ষ্ট্যালিন, মলোটভ সবাই

এসে তোদের কি বললে। কাগজে যেন দেখেছিলাম।" বৃদ্ধ অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

"ষ্ট্যালিন বললো আমরা নোতুন লোক, আমাদের ধারা নোতুন, আমাদের সময় নোতুন। আমরা যেন ঝঞ্ঝা। কিন্তু সে অনেক কথা কাকা। একদিন এসো বলবো। আজ যাই।" নিকিতা চলে যায়।

১৯৩৯ সাল। উজবেকিস্থানে আজ ফুলের সমারোহ। দীর্ঘদিনের অত্যাচারে পিষে মরা মানুষের মুখে আজ হাসির ফুলঝুরি। সবার মুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা উজবেকিস্থানকে গড়ে তুলবে, ফলে ফুলে ফসলে এক নয়া দেশ। ঘুম থেকে উঠেই ছোট ছোট ছেলেপিলেরা ছুটে গেছে ফুল কুড়াতে। আজ তাদের আনন্দ ধরে না। "দশটার সময় আজ আমাদের খাল কাটার উৎসব হবে। ঠিক দশটায়,"—গাছ তলায় খুব ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে ছেলেটা।

"দশটা তো বাজে, তাড়াতাড়ি নাও।" হাত চালাতে চালাতে আর একটা ছেলে বলে।

"দূর, এখন কোথায় ?"

"দশটার সময় গেলে হবে ? আরো কাজ আছে না ?"

"জানো, খালটা কত বড় ?"

পথ দিয়ে আসছিল পঞ্চায়েতী খামারের সভাপতি। একটু অজ্ঞতার ভান করে সভাপতি বললো, "কত বড় ? তোমাদের চেয়ে বড় ?" আচমকা কথা শুনে ছেলে দুটো একটু চমকে ওঠে। তার পর হেসে বলে, "কমরেড সভাপতি, কত বড় ?"

সভাপতি ঠাট্টার সুরে বলে, "তা অনেক হবে'—ভল্গার মত ?"

"দূর !" ছেলে দুটো আব্দারের সুরে বলে ওঠে, বলো না !"

"অনেক বড়, দুশো সত্তর কিলোমিটার। এখানকার শ্রমিকরা মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনে ওটা কেটেছে।"

"ওর নাম কি দিয়েছে যেন—"

"হুঁ ষ্ট্যালিনের নামে ওর নাম হয়েছে। জানিস ষ্ট্যালিনকে কবিতায় অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

"কবিতা খুব ভাল লাগে, তাই নাকি ?"

"হুঁ," সভাপতি যেন হঠাৎ অন্য কোন জগতে চলে যায়। হাসি খুশি মুখ কালো হয়ে ওঠে। ছেলে দুটো যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

"কেন, কমরেড, হঠাৎ মুখ অমন—" অপরাধীর মত ছেলেরা বলে ওঠে।

"জানিস্, আবার যুদ্ধ বাধবে। জার্মাণী পোল্যাণ্ডকে গিলে খেয়েছে। আমাদের লাল পল্টন এগিয়ে গেছে। সভাপতি একটু চুপ করে থাকে। তার পরে মুখে আবার জোর করে হাসি টেনে এনে বলে, "কিন্তু সে অনেক দূরের কথা। এখুনি তোমরা চলে যাও—অনেক কাজ।" সভাপতি চলে যায়। মুখ ভার করে ছেলেরা গাছ তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

* * *

১৯৪১ সাল। ২২শে জুন। সবাই আশঙ্কা করছে হিটলারের আবার কোন নোতুন আক্রমণ হবে। ভয়ের

ছাপ মুখে লেগে আছে সকলের। তবু এখনও আশা আছে। এমন সময় রেডিও গর্জন করলো। সবাই চমকে উঠলো। রেডিও থেকে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর কথাগুলো।...কারখানার এ্যামপ্লিফায়ার ছড়িয়ে দিচ্ছে—"আজ সকাল চারটার সময় জার্মানী অতর্কিতে আক্রমণ করেছে সোভিয়েটকে। কোন দাবী করেনি আমাদের কাছ থেকে, আমাদের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করেনি জার্মানী। সভ্য জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা খুব অল্পই আছে। জার্মানীর সাথে আমাদের যে চুক্তি আছে—অনাক্রমণের চুক্তি—আমরা তো তাকে সম্মান দিয়েছি। ফ্যাসিস্টরা দস্যুর মত তার জবাব দিয়েছে।

"আজ সকালে পাঁচটার সময় জার্মান রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন যে, পোল্যাণ্ডের দিকে আমাদের সৈন্য থাকার জন্য জার্মানী আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছে। তার উত্তরে আমি বললাম, 'আমরা তো শান্তি চেয়েছি। আক্রমণ করেছে ফ্যাসিস্ট জার্মানী।"

ধীরে ধীরে জমে ওঠে গোটা গ্রামের লোক। অবাক হয়ে শোনে। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় সবাই।

"এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। কে না জানে জার্মানী এমন ভাবে সভ্যতার সর্বনাশ করে। ওরা কি জার্মানীর নিজের সভ্যতাই নষ্ট করেনি?

"জার্মানী তো কবি দার্শনিকের দেশ। ওখানে তো গেটে কাণ্ট, হেগেল, মার্কস সবাই জন্মেছেন। আজ সেখানে দেখো পশুর রাজত্ব। বার্লিন, মিউনিক, ড্রেসডেন—; ওখান কার পার্কে পার্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিনের

বই পুড়িয়ে ফেলছে। ডারউইন, গোর্কি, আইনস্টাইন, কেউ বাদ যায় নি।

"সব ভাল ভাল লোক প্রাণ নিয়ে ওখান থেকে পালিয়েছে। ফ্যাসিষ্টদের মুখে মুখে একটা কথা ঘোরে, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করো, সমাজের কুলাঙ্গার ওরা। ওরা এটার নাম দিয়েছে "আর্য সভ্যতা"। পোল্যাণ্ডের সমস্ত স্কুল কলেজ তুলে দিয়েছে। ক্রেকাউ ইউনিভারসিটির একশ সত্তর জন অধ্যাপককে ইতি মধ্যে বন্দী করেছে। পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক ওকলেভ বার্নেটকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।...

"আমাদের দেশে সহজে বিপ্লব সার্থক হয় নি। তার জন্য দিতে হয়েছে আমাদের রক্ত। আমরা এখনো অনেক শহর তৈরি করবো, অনেক খেতে এখনো আমরা ফসল ফলাবো। আমরা নোতুন রাশিয়া গড়ে তুলবো। ফ্যাসিষ্টরা মানুষ সমাজকেই ঘৃণা করে, আর আমরা মানুষকে ভালবাসি।

"ফ্যাসিষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব নেই। ওরা কারো বন্ধুত্ব চায় না।

"শত্রুর বিরুদ্ধে চাই আমাদের শত্রুতা—"

* * *

৩রা জুলাই, ১৯৪১ সাল। রেডিও আবার গর্জন করে উঠলো। এরোপ্লেনে ইঞ্জিনের প্রপেলার ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কারখানার কল চলতে চলতে থেমে গেল, পথে মানুষ সার বেঁধে দাঁড়াল। জর্জিয়ান ভঙ্গিতে রেডিও গর্জন করছে—

"কমরেডস্ ! দেশবাসী !
"আমার ভাই বোন !
"সৈন্য বাহিনী !

"আমি আপনাদের কাছে বলছি।

"২২ শে জুন আমাদের দেশের ওপর জার্মানী আক্রমণ শুরু করেছে! সে আক্রমণ এখনও চলছে। শত্রু এনেছে তার সব চেয়ে শক্তিশালী বাহিনী, আমাদের লালফৌজ বীরত্বের সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করছে। তবু শত্রু কিছুদূর এগিয়ে এসেছে। তারা লিথুয়ানিয়াকে গ্রাস করেছে, ল্যাটভিয়ার কিছুটা নিয়ে নিয়েছে, বেলোরাশিয়া আর ইউক্রেন করেছে গ্রাস। তাদের বিমান এসে কিয়েভ, সিবাস্তাপোল, ওডেসার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

"আমাদের গৌরবময় লাল ফৌজ কিছুটা হটে এসেছে। কেন? কি করে এটা হলো? তাহলে ফ্যাসিষ্টরা যা রটিয়ে বেড়াচ্ছে তা কি সত্যি? জার্মান সেনা কি সত্যই অপরাজেয়?

"না, তা কক্ষনো না। ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে—কোন অপরাজেয় সেনা নেই, কোন অপরাজেয় সেনা থাকতে পারে না। নেপোলিয়নের সেনা দলকে মনে হয়েছিল অপরাজেয় তবু সে হেরে গেছে রাশিয়ার সেনার কাছে, ইংলণ্ডের, জার্মানীর কাছে। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কাইজারের সেনা দলকে মনে হয়েছিল অপরাজেয়; তবু সে হেরে গেল রাশিয়ার কাছে—।

"তবু জার্মানী আমাদের কিছুটা হটিয়ে দিয়েছে। তার কারণ জার্মানী আমাদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থা থেকে

আক্রমণ শুরু করেছে, তারা এক শ' সত্তর ডিভিসন্ সৈন্যকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। তারা ছিল পুরোপুরি তৈরী হয়ে; অপেক্ষা করছিল একটা মাত্র ইঙ্গিতের। আর আমাদের সেনাবাহিনীকে ঠিক করে তবেই তাকে ফ্রণ্টে পাঠাতে হবে।...

"আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—যে সরকারের নেতা হিটলার, রিবেনট্রপ সেই সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট সরকার কি করে চুক্তি করতে পারে? সেটা কি তার একটা ভুল? না, তা কখনো নয়। অনাক্রমণ চুক্তি হলো দুটো সরকারের ভেতর শান্তির চুক্তি। ১৯৩৯ সালে জার্মানী ঠিক এই চুক্তির কথা বলেছিল। সোভিয়েট সরকার কি এমন চুক্তিতে নারাজ হতে পারে?...এ কথা তো জানাই সোভিয়েট আর জার্মানীর ভিতর ঠিক এমনি এক চুক্তি ছিল।"

রেডিও গর্জন করে চলেছে। ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা। একটি মানুষের মত মনোযোগ দিয়ে সমস্ত লোক শুনে চলেছে। মাঝে মাঝে বুকটা ফুলে উঠছে—"আমাদের ভেতর ভীরু, গুজব-বাজ, এদের কোন ঠাঁই নেই। যুদ্ধে আমাদের কোন ভয় নেই। ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে আমাদের এই মহান মুক্তি সংগ্রামে আমরা সবাই এসে যোগ দেব। আমাদের এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন বলতেন সোভিয়েট মেয়ে, ছেলে সবার ভেতর প্রধান গুণ হবে সংগ্রামে ভয়শূন্যতা। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের দৃঢ়তা—আমাদের অগণিত মানুষকে এই বলসেভিক গুণ আয়ত্ব করতে হবে।

"এবার থেকে আমাদের সমস্ত কাজ কর্ম হবে যুদ্ধের জন্য। সবার আগে আসবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দাবী, তারপরে আসবে অন্য সব কিছুই। শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য এ আমাদের করতেই হবে। লাল ফৌজ, লাল নৌ বহর, সোভিয়েটের প্রত্যেকটি নরনারী প্রত্যেকটি ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার জন্য যুদ্ধ করবে, তারা বুকের রক্ত ঢেলে দেবে।

"ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে এই যুদ্ধকে একটা সাধারণ যুদ্ধ হিসাবে মনে করলে আমরা ভুল করবো। এতো দুটো সেনাদলের যুদ্ধ নয়। জনগণের এই মুক্তি সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য শুধু মাত্র সোভিয়েটের আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার নয়, জার্মান ফ্যাসিষ্টদের পায়ের তলায় যে সব অগণিত মানুষ আর্তনাদ করছে তাদেরও মুক্তি চাই। এই যুদ্ধে আমরা একা নই। আমরা বন্ধু হিসেবে পাবো ইওরোপ আমেরিকার জনসাধারণকে, এমন কি জার্মানীর ভিতরের বন্দী মানুষকে।

"কমরেডস্। আমাদের আছে অগণিত বাহিনী। শত্রু এ কথাটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝবে। লাল ফৌজের সাথে সাথে সহস্র সহস্র শ্রমিক, কৃষক, সবাই এগিয়ে আসবে শত্রুর মুখোমুখি। প্রত্যেকটি লোক ঝাঁপিয়ে পড়বে সংগ্রামে।

"আমরা সব কিছু দিয়ে লাল ফৌজ আর নৌবাহিনীকে সাহায্য করবো! শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সকল শক্তি নিয়োগ করবো!

"আমরা জয়ের পথে এগিয়ে যাবো!"

* * *

মস্কৌ। আজকে সমস্ত লেখকদের সভা বসেছে। সভাপতি বলে চলেছেন, "আজকে আমরা যে যুদ্ধে নেমেছি তা একটা সাধারণ যুদ্ধ নয়!

"আজকের যুদ্ধ হল প্রগতিশীল সমস্ত জনসাধারণের সাথে দানবের যুদ্ধ!

"এ যুদ্ধ উপনিবেশ বিস্তারের জন্য নয়, নোতুন রাজ্য-জয়ের জন্য নয়, তার সীমা রেখা টানার জন্যও নয়।

"এর মূল উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়, সৃষ্টি।

"যুগ যুগ ধরে মানুষ যে মহান ঐতিহ্য রচনা করেছে আজকে তা এসেছে মৃত্যুর সামনে।

"তাই শত্রুর ধ্বংসের জন্য কামান বন্দুক গড়বার সাথে সাথে আমাদের নোতুন শিল্প সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিকামী জনসাধারণ রুদ্ধ নিশ্বাসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—"

মাথার উপরে আবার এরোপ্লেন গর্জন করে উঠলো।

* * *

ক্রাইয়েগের সংবাদদাতা আজ খবর পাঠাচ্ছে ভল্গার, ষ্ট্যালিন-গ্রাডের।

"...প্রত্যেকটি দেওয়াল যেন কথা বলছে—'ষ্ট্যালিন-গ্রাডকে বাঁচাবো।' গ্রামে গ্রামে, গাছে গাছে, সবখানেই একটা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে 'আমার ভল্গা!' 'আমার ষ্ট্যালিন

গ্রাড! প্রত্যেকটি লোকের মুখের এক কথারই প্রতিধ্বনি 'রুখবো, আমরা রুখবো!'

"পথে পথে মিলিটারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভল্গা যেন তাদের কানে কানে বলছে, "ভয় কি, বিজয়ের পথে এগিয়ে চল।" ২৩শে আগষ্ট জার্মানী আক্রমণ করলো ষ্ট্যালিনগ্রাড।" সারা শহর দাউ দাউ করে উঠলো জ্বলে। পুড়ে গেল, এত দিনের পরিশ্রমের ফল পুড়ে গেল। দু'মাস ধরে ষ্ট্যালিনগ্রাডকে তারা অবরোধ করে রাখলো। দু'মাস ভল্গার পাশে ষ্ট্যালিনগ্রাডের বুকে আগুন জ্বললো। জার্মানরা আকাশ থেকে লিফলেট দিল— "আত্মসমর্পণ করো।" ষ্ট্যালিনগ্রাডের বুকে ওদের প্রত্যেকটা কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

"বোমায় বোমায় ভল্গার বুক বিকৃত হয়ে উঠেছে। একদিন এর পাশে মাথা তুলেছিল ঝক্‌ঝকে শহর। বোমা ঝরছে—মানুষ মরছে, আগুনের হলকা ছুটছে, তবু এক আহত মেয়ের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে, "ভয় কি! আমরা—আমরা জিতবোই। আমাদের তারা খুন করতে পারে তবু এ দেশ আমাদেরই।"

"ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রত্যেকটি লোক আজ জার্মানদের মুখোমুখি। আহত ষ্ট্যালিনগ্রাড, তবু একজন জেলের কথা মনে ভেসে উঠছে। উলটে গিয়েছে নৌকোর সব লোক। তার ভেতর ছিল এক নোতুন লেফট্‌ন্যাণ্ট। সে ডুবে যাচ্ছে। বুড়ো মাঝি তার জামার কলারটা চেপে ধরলো, তারপর লাইফ বেল্ট খুলে বললো, তাড়াতাড়ি ধরে ফেল। লেফট্‌ন্যান্ট সেটাকে ধরে উঠতে চেষ্টা করছে।

'ওরে' হতভাগা, আমার একটা দাঁত উড়ে গেছে। তবু আমি যতটুকু পারি করেছি। এবার ওঠ্ ষ্ট্যালিনগ্রাডকে বাঁচা।'

"একটা হাত দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এবার সে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে।"

* * *

সেনাপতি স্ট্যালিন। স্ট্যালিনগ্রাডের প্রাণ ফিরেছে। জার্মানরা আর এগিয়ে আসতে পারছে না। মেসিনগান গর্জন করছে, জার্মানরা হটে যাচ্ছে। জার্মানরা আজ তাদের লোকসানের হিসেব করছে। যেখানে তারা কোরোলকোভ আর সেডালভের দেখা পেয়েছে সেখানেই তারা থমকে গিয়েছে। ওখানে তো কোন দুর্গ নেই, তবু এ দুটো মানুষই যেন দুর্গ রচনা করেছে! মাত্র এরা দু'জন। কিন্তু এদের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে হাজার হাজার নরনারী, হাজার হাজার রাশিয়ান। মুখে মাত্র তাদের একটা কথা,—"এর নামের সাথে ষ্ট্যালিনের নাম জড়ানো। গৃহ যুদ্ধের সময় এখানেই তো স্ট্যালিন আর ভরোশিলভ পাশাপাশি লড়ে একে রক্ষা করেছে। আজ আমরা কখনও তাকে ছেড়ে দিতে পারি ?"

* * *

ড্মিট্রি আজ ধরে বসেছে সে যুদ্ধে যাবেই। ড্মিট্রি উরালের কারখানার একজন শ্রমিক। সে আবেদন করেছে, এবার তাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দেওয়া হোক্। কিন্তু তা হয়নি। তার উপর হুকুম এসেছে এখানে কারখানায়

সব চেয়ে বেশি জিনিস তৈরি করবার। এই তার যুদ্ধ। সে মুখ ভার করে কাজে যোগ দিয়েছে। ট্রেড- ইউনিয়নের সভাপতি তার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

"তুমি কি মনে কর ফ্রন্টে গিয়ে দু'চারটে বন্দুক ছুঁড়লেই খুব বীরত্ব দেখান হলো।" সভাপতি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

"আমার বহুদিনের ইচ্ছা রয়েছে। এতদিন আমি যাইনি। কিন্তু এখন তো জিনিস তৈরি হচ্ছে খুব বেশি।"

"খুব বেশি? তুমি বলছো? ওধারে যে কল কারখানা ছিল তা সব এধারে আসছে। এখন আমাদের কত কারখানা গড়ে তুলতে হবে। আমরা যদি এখন কাজে একটু ঢিল দেই তা হলে ফ্রন্ট একেবারে মারা পড়বে। জানো, এখন ষ্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। ষ্ট্যালিন নিজে এসব কাজের কথা বলেছেন—সেদিকে খেয়াল নেই। এবার যে বেশি কাজ করতে পারবে, কাজের যে নোতুন নোতুন উপায় বার করতে পারবে তাকেই ষ্ট্যালিন প্রাইজ দেওয়া হবে। তোমার চোখের সামনে রয়েছে মারিনভ। কেন, তার কথা মনে নেই। যুদ্ধের আগে ষ্ট্যালিনের কথা মনে পড়ে না? তিনি কি বলেছিলেন?"

"বাঃ সে তো কোন কথা হচ্ছে না।"

"তবে কথাটা কি? সেই জন্য তোমার ওপর আদেশ হয়েছে তোমার যুদ্ধ এই কারখানার ভেতর—ষ্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন গড়ে তোলায়। আমারাও সে কাজ পারবই, আমরা

সবাই যে সোশ্যালিষ্ট।—অসম্ভবকে আমরাইতো সম্ভব করবো।”

*　　　*　　　*

পানয়ার গড়ন বেশ মোটাসোটাই হবে। যখন জার্মানরা আক্রমণ করেছিল তখন সে গেরিলা দল গড়ে তুললো।

“আচ্ছা তুমি কেমন করে শুরু করলে?” প্রশ্ন করে একজন সাংবাদিক।

“কেন? জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে এমনি আরো অনেক লোককে দেখলাম।

“তা প্রায় জন পঞ্চাশেক হবে। সে গ্রামে ছিল মাত্র একশ' সত্তর জন জার্মান। তাই সুবিধে হয়ে গেল। প্রথমেই এক বিজয়। সেখান থেকে পেলুম রাইফেল, বন্দুক—” লিজা বলতে থাকে। লিজা—পানয়ার এক বন্ধু—একই দলের।

“তোমাদের বন্দুক ছুঁড়তে শেখাল কে? সেনাদলের কেউ নিশ্চয়?” সাংবাদিক প্রশ্ন করে।

“আমাদের দলে গোটাকতক মাত্র বুড়ো মানুষ ছিল। তারাই কিছুটা আমাদের শিখিয়েছিল। আর তা ছাড়া আমরা বই পড়ে শিখে নিয়েছিলাম।” লিজা উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে।

হঠাৎ কখন পানয়া আপন মনে বলতে শুরু করে,

“সত্যি লোকদের কি কষ্ট! তারা না খেয়ে রয়েছে। করাতের গুঁড়ো দিয়ে তারা রুটি তৈরি করে। জার্মানরা যখন প্রথম এখানে এলো তখন তারা অমনি একটাকে তুলে

নিয়ে বলেছিলো, 'এই দেখো রাশিয়ানদের রুটি!' কমরেড ওদের প্রত্যেকটিকে আমরা মেরে ফেলবো।"

"খুব সাংঘাতিক কথা বলছো পান্‌য়া! তুমি কি একটা লোককেও মারতে পেরেছে?"

"না, ঠিক বলেছেন। আমি একটা মানুষকেও মারতে পারিনি। তবে গোটাকতক নাৎসীকে মেরেছি।"

"কি করে মারলে?"

"কেন? অবাক হয়ে যায় পান্‌য়া। বলে, "প্রথমে গুলি করলাম। তারপর দেখি পড়ে রয়েছে।"

"তার পরে তোমার মনের অবস্থা কেমন হলো?"

"সত্যিই আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। কারণ আমি যে এক জন মেয়ে। যারা আমাদের ঘর বাড়ি নষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের তরুণদের পুড়িয়ে মারছে, তাদের উপর আমি যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছি সেই তো আমার গৌরব। আমি কি কখন ভুলতে পারি, আমি যে মেয়ে।"

"আচ্ছা তোমরা কি এমনি ভাবে তাদের ধ্বংস করবে?" সাংবাদিক প্রশ্ন করে।

"কেন, না?" উত্তর দেয় লিজা। "আমরা শুধু নাৎসীদের ধ্বংস করবো। ভাল জার্মান যারা তাদের কেন মারতে যাবো? আমাদের সব চেয়ে বড় গোলন্দাজ যে একজন জার্মান।"

"কেন? আপনারা কি ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা শোনেন নি? তিনি তো পরিষ্কারই তা বলে দিয়েছেন। অবশ্য ধনিকদের দেশের কাগজ প্রচার করছে যে লালফৌজ চায় জার্মান জাতিকে

ধ্বংস করতে। এটা হলো একটা আজগুবি গল্প, লালফৌজের ওপর কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা!”

* * *

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আবার চারিদিকে শান্তির আগমনী গান। আজকে আবার সোভিয়েট দেশে নোতুন নির্বাচন শুরু হবে। ষ্ট্যালিন তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতা দেবেন আজকে। নানা দিক থেকে লোক ছুটে আসছে। তারা হয়ত ভোট দেবে না। ষ্ট্যালিনের কেন্দ্রের ভোটার তারা নয়। তবু তারা এসেছে। ষ্ট্যালিন বলছেন ঃ

“কমরেডস! আট বছর পার হয়ে গেছে, তার পরে আবার আসছে সুপ্রিম সোভিয়েটের নির্বাচন। এই আট বছর নানা ঘটনায় ভর্তি। প্রথমে চার বছর ধরে আমরা তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ করে এসেছি। আর দ্বিতীয় চার বছর কেটে গেছে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে।...

“আমাদের বিজয়ের সার কথা হলো সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার বিজয়। সোভিয়েট ব্যবস্থা যুদ্ধের পরীক্ষায় উতরে গিয়েছে। আমরাও জানি বিদেশের সংবাদপত্র প্রচার শুরু করেছিল সোভিয়েট ব্যবস্থা একটা তাসের ঘর, জীবনের সাথে ওর কোন যোগ নেই। তাই এক ধাক্কায় তা মাটিতে গুঁড়িয়ে যাবে। এবার যুদ্ধের ফলে সেই সব শত্রুদের সমস্ত কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সোভিয়েট ব্যবস্থা একমাত্র জনসাধারণেরই ব্যবস্থা। তাদের সমর্থনের উপর এ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে।

"এই যুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থা জয়ী হয়েছে। বহু জাতির দেশ সোভিয়েট যুদ্ধের আগুনে তার স্থায়িত্ব প্রমাণ করেছে। অনেক সাংবাদিক বলেছিলেন যে, এই বহু জাতির দেশ সোভিয়েট কৃত্রিম, এ ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী। যে কোন রকম সংকটে এ একেবারে ধসে পড়বে। এখন আমরা বলতে পারি ওই সব সাংবাদিকদের কথার কোন ভিত্তি নেই। যুদ্ধের ভেতর বহু জাতির দেশ সোভিয়েট অনেক শক্তিশালী হয়েছে।

"আমাদের যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে সোভিয়েটের সেনা, তার লালফৌজ যুদ্ধের সকল রকমের দুঃখ কষ্ট সইতে পারে, শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে। আজকে শত্রুমিত্র সবাই লালফৌজের প্রশংসা করে। কিন্তু ছ' বছর আগে তো এমন ছিল না।"

সত্যিই তাই। সোভিয়েটের জয়গান আজ পৃথিবীর সকলেরই মুখে মুখে। লেনিনের উপযুক্ত শিষ্য ষ্ট্যালিন আপনার হাতে জাতির নেতৃত্বের ভার নিয়েছেন। তাই জার্মান যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয় ক্ষতি উপেক্ষা করে চলেছে সোভিয়েটের জয়যাত্রা। আর ষ্ট্যালিন হলেন সেই অগ্রগামী সোভিয়েটেরই প্রতীক। বলসেভিকদল ও সোভিয়েট ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই ষ্ট্যালিনের জীবন! তাই আজ সোভিয়েটের জনগণ পাগল হয়ে চীৎকার করে:

"ষ্ট্যালিন দীর্ঘজীবী হোন!"

সমাপ্ত